শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
জোতিষ	জ্যোতিষ	৫	২২
প্রাধান	প্রধান	৮	৪
তর্কালকার	তর্কালঙ্কার	ঐ	৬
সৌখ্য	সখ্য	ঐ	২০
হনরেবল্	অনরেবল্	৯	১৯
তর্কলঙ্কার	তর্কালঙ্কার	১০	৭
সৌকার্য্য	সৌকর্য্য	ঐ	১২
গ্রীশ	গিরিশ, গিরীশ	১৮	১০
সৌহার্দ্য	সৌহার্দ্দ	২১	২০
দুর্দ্ধষ্য	দুর্দ্ধর্ষ	২৮	১৭
শর্য্যা	শয্যা	৩০	২১
ধূষরিত	ধূসরিত	৩৩	১৬
শৈশবস্থা	শৈশবাবস্থা	৩৫	১৩
জেষ্ঠা	জ্যেষ্ঠা	ঐ	১৫
কন্যাপেবং	কন্যাপ্যেবং	ঐ	২১
সম্বদ্ধিনী	সম্বন্ধিনী	৩৬	৬

গ্রন্থ কর্ত্তার জীবন চরিত।

—— ০০ ——

৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার খৃঃ ১৮১৭ শকে নদীয়াজেলার অন্তর্গত বিল্লগ্রাম নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা সংস্কৃতকালেজের একজন লিপিকর ছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ ৫টী সন্তান ছিল। দুই পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম মদনমোহন ও গোপীমোহন। মদনমোহন প্রথম সন্তান ও গোপীমোহন চতুর্থ সন্তান। রামধন চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতকালেজের কার্য্য হইতে অবসৃত হইলে তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতা রামরতন চট্টোপাধ্যায় উক্ত কালেজের লিপিকরের পদ প্রাপ্ত হন। তর্কালঙ্কারের অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পিতৃব্য রামরতন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কলিকাতায় আনীত ও সংস্কৃত কালেজে অন্তর্নিবিষ্ট হন। তথায় অতি অল্প দিন থাকিয়াই তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া বাটী গমন করেন। বাটীতে রামদাস ন্যায়রত্ন, বনমালী বিদ্যারত্ন

ও শিবনাথ সিদ্ধান্ত এই পণ্ডিত মহোদয়-গণের নিকট ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন বাটীতে বিদ্যাধ্যয়নের পর তিনি আবার কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট হন। সংস্কৃত কালেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হওয়ার পর হইতে তাঁহার আদ্যোপান্ত বিদ্যালয়-জীবন সংস্কৃতকালেজের রিপোর্ট পুস্তক হইতে গৃহীত হইল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তর্কালঙ্কার মহাশয় দ্বিতীয়বার সংস্কৃতকালেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার তৎকালে বয়স দ্বাদশবৎসর ছিল। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয় সংস্কৃতকালেজে প্রথম প্রবিষ্ট হন। তাঁহার বয়স তৎকালে দশবৎসর। তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর একশ্রেণীতে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উদারচিত্ত ও অসাধারণ প্রতিভায় উভয়ের কেহ কাহারও ন্যূন ছিলেন না। প্রথম পুরস্কার ইহাঁদিগের দুইজন ব্যতীত অপর কেহ পাইতে পরিত না। ক্রমে ক্রমে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর পর-স্পরের প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব অতি গাঢ় ও গভীর ছিল।—

দুইজনে প্রতিদ্বন্দী হইলে, পরস্পরের উন্ন-
তিতে পরস্পরের মনে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত
হইবার সম্ভাবনা কিন্তু তাঁহাদের উদারচিত্ত
পরস্পরের উন্নতিতে বিন্দুমাত্র কাতর
হইত না। বরং উভয়ের সাহায্যে উভয়েই
উন্নত হইতে লাগিলেন। তিন বৎ-
সরকাল ব্যাকরণশ্রেণীতে মুগ্ধবোধ পাঠ
করিয়া উভয়েই সাহিত্য শ্রেণীতে উঠিলেন।
তর্কালঙ্কারের রচনা প্রণালী অতি সুললিত
ও প্রাঞ্জল ছিল। বিশেষতঃ এই অল্প
বয়সেই তিনি আপনার অসাধারণ কবিত্ব
শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। অতি অল্প
সময়ের মধ্যেই তিনি বহু সংখ্যক অতি
উৎকৃষ্ট ২ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারি-
তেন। এইজন্য সাহিত্য শ্রেণীতে তিনি
অধ্যাপকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আদর
ভাজন হইয়াছিলেন। তৎকালে জয়গোপাল
তর্কালঙ্কার সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন।
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহার এই আশ্চর্য্য
কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে
পারিতেন না। দুই বৎসর সাহিত্য শ্রেণীতে
অধ্যয়ন করিয়া উভয় বন্ধুই অলঙ্কার শ্রেণীতে

অলঙ্কার পাঠ আরম্ভ করেন। সুধীশ্বর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তৎকালে অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন। তর্কালঙ্কারের অসীম সহৃদয়তা ও ভাবগ্রাহিতায় তর্কবাগীশ মহাশয় তাঁহার উপর অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। এই অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়েই সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণীনামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার বিচিত্র কবিত্ব শক্তির প্রথম পরিচয় দেন। রসতরঙ্গিণীর রচনা এত সুমধুর ও প্রাঞ্জল যে আদি রস পূরিত না হইলে বোধহয় ইহা আবালবৃদ্ধ সকলেরই হৃদয় মন হরণ করিত। আমার বাক্যের পোষকতা সমর্থনের নিমিত্ত দুই এক স্থান হইতে শ্লোকচয় উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের নিকট ধারণ করিতেছি। তাঁহারা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে বঙ্গভূমি কিরূপ রত্ন হারাইয়াছেন।

"নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে।
দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে॥
ইহা দেখে বিধি কৈল রমণীর মুখ।
দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ॥
অতএব একবারে বিজ্ঞ হওয়া ভার।
দেখিয়া শিখিয়া হয় নৈপুণ্য সবার॥"

" বরং দিবস ভালো নিশা যেন হয় না।
অথবা নিশাই ভালো দিন যেন রয় না॥
কিংবা এ উভয় সখি! প্রাণে আর সয় না।
প্রিয়বিনে আর মনে কিছু ভালো লয় না॥"

রসতরঙ্গিণী হইতে যে দুইটী শ্লোকচয় উদ্ধৃত হইল ইহা যে ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগ তাহা নহে। সমুদায় রসতরঙ্গিণীর মধ্যে ঐ দুইস্থান অনশ্লীল বলিয়াই উহা উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ রসতরঙ্গিণী আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে তর্কালঙ্কারের কবিত্ব শক্তির প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন না। যে কবি সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে এরূপ রমণীয় কবিতা লিখিতে পারিয়াছিলেন, তিনি পরিণত বয়সে কবিতা লিখিলে যে কত দূর চমৎকার হইত তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। পাঠকগণের ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে তর্কালঙ্কারের লেখনী হইতে যৎকালে রসতরঙ্গিণী বহির্গত হয় তখন আধুনিক অন্য কোন লেখকের লেখনী হইতে কিছুই বিনির্গত হয় নাই।

অলঙ্কার শ্রেণীতে দুই বৎসর পাঠ করিয়া তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর কিছুদিন জোতিষ শাস্ত্র পাঠ করেন। জোতিষের পর

কিছু দিন দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া স্মৃতি শ্রেণীতে স্মৃতি পাঠারম্ভ করেন।

স্মৃতি শ্রেণীতে উঠিয়াই তর্কালঙ্কার মহাশয় বিংশ বৎসর বয়ক্রম কালে বাসবদত্তা রচনা করেন। এরূপ শুনিতে পাই যে ভারতচন্দ্রকে পরাজয় করাই তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বাসবদত্তা সমাপ্ত হইলে তর্কালঙ্কার মহাশয় বাসবদত্তা ও বিদ্যাসুন্দর উভয় পুস্তকের রচনা প্রণালী সমালোচনা করিয়া বিদ্যাসুন্দর উৎকৃষ্ট হইয়াছে স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আর কখন কবিতা লিখিবেন না। তদবধি প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার শেষ ভাগের কবিতা গুলি ব্যতীত জীবনে আর কবিতা লিখেন নাই। এই প্রবাদ যদি সত্য হয় তবে ইহা অতিশয় শোচনীয় ঘটনা বলিতে হইবে। কারণ যে কবি বিংশবৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন প্রায় ভারতের তুল্য হইয়াছিলেন তখন আরও কবিতা লিখিতে লিখিতে তিনি যে পরিণত বয়সে ভারতকে পরাজয় করিতে পারিতেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

স্মৃতি শ্রেণীতে তিনবৎসর অধ্যয়ন করিয়া

তৃতীয় বৎসরের শেষে স্মৃতি শাস্ত্রে পরীক্ষা দেন। একশত একবিংশ প্রশ্নের মধ্যে তিনিই কেবল অষ্ট চত্বারিংশ প্রশ্নের উৎকৃষ্ট রূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার ঊর্দ্ধ আর কেহ পারেন নাই। তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর উভয়েই এই স্মৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জজপণ্ডিতের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষার পর ১৮৪২খৃঃঅব্দে তর্কালঙ্কার বিদ্যালয়-জীবন সমাপ্ত করেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ কলিকাতায় বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হন। পরে বারাসাতের গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের প্রথম পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন। বারাসাতে এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজের অধ্যাপকের পদে আরোহণ করেন। তথায় দুই বৎসর অতি সুচারুরূপে অধ্যাপনা কার্য্য সামাধান করেন। ইংলণ্ডীয় ছাত্রেরা তাঁহাকে এত ভক্তি করিতেন যে বিল্বগ্রামের নাম শুনিলে কর উত্তোলন করিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। ফোর্ট উইলিয়ম্ কালেজে দুই বৎসর অবস্থিতি করিয়া কৃষ্ণনগর কালেজ সংস্থাপিত হওয়ার

পর তথাকার প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণনগর কালেজের প্রাচীন ছাত্রগণের প্রায় অধিকাংশই তাঁহার নিকট বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। উক্ত কালেজের প্রাধান পণ্ডিতের আসন এক বৎসর অলঙ্কৃত করিয়া তর্কালকার মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার যশঃ শশাঙ্ক এই সময়েই পূর্ণকল হয়। সংস্কৃতকালেজ তাঁহার অবস্থিতিতে অতি উজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার সুমধুর বচনবিন্যাস ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ছাত্রগণের শ্রবণে সুধাবর্ষণ করিত। সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন মনে করিতেন। নিরহঙ্কারতা, বালক-সদৃশসারল্য ও অমায়িকতা তাঁহাকে সকলের নিকট প্রিয় করিয়াছিল। তাঁহার যশঃ সৌরভ ইংরাজ-মণ্ডলীতে ক্রমে ক্রমে বিধৃত হইতে লাগিল। তখনকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ বঙ্গকামিনীজন-পরম সুহৃৎ পণ্ডিত-শিরোমণি বেথুন্ সাহেব তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত সৌখ্য সংস্থাপন করিলেন। ইঁহাদের উভয়েরি মন বঙ্গীয় অবলাগণের উন্নতিসাধনে একান্ত ব্যগ্র ছিল।

এক্ষণে উভয়ের সাহচর্য্যে সেই ব্যগ্রতা দ্বিগুণ-তর হইয়া উঠিল। বেথুন্সাহেব শিক্ষা বিভা-গের ডিরেক্টর। তাঁহার যে অভিলাষ সেই কার্য্য। বঙ্গবালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তিনি বেথুন্-বালিকা-বিদ্যালয় নামক একটী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন। পাঠকগণ! শিমলার হেদোর উত্তর পশ্চিম কোণে যে রমণীয় অট্টালিকা দেখিতে পান উহা সেই বেথুন্ সাহেবের কীর্ত্তিস্তম্ভ। ঐ অট্টালিকার ভিত্তি-পত্তন দিবসে তর্কালঙ্কার ও বেথুন্ উভয়ে সম-বেত হইয়া ভিত্তির নিম্নে নবরত্ন নিখাত করেন। অট্টালিকা নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইল। কিন্তু আপন আপন কন্যা পাঠাইতে কেহই অগ্রসর হইলেনন না। তর্কালঙ্কারমহাশয় ভুবন-মালা ও কুন্দমালা নামক আপনার দুই কন্যাকে সর্ব্বপ্রথমে বেথুন্ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া বঙ্গদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের স্থষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জগম্মান্য হইলেন। হাইকোর্টের বিগত বিচার পতি হনরেবল্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণের অধ্যাপক পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রভৃতি তর্কালঙ্কারের সাধু দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন

করিলেন। ক্রমে বেথুন্ বিদ্যালয়ে বালিকা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বালিকা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল বটে কিন্তু তখন বঙ্গভাষায় বালক বালিকাদিগের পাঠোপযোগি কোন পুস্তক না থাকায় শিক্ষাকার্য্যের অতিশয় ব্যাঘাত হইতে লাগিল। এরূপ দুরূহ শিক্ষা কার্য্যের ভার তর্কলঙ্কার ব্যতীত আর কেহ লইতে সক্ষম ছিলেন না বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপরই উহা অর্পিত হইয়াছিল। শুদ্ধ মুখে শিক্ষাদিলে বালিকারা তাহা ধারণা করিতে পারিবে না বলিয়া শিক্ষাকার্য্যের সৌকার্য্য বিধানের নিমিত্ত তর্কালঙ্কার ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত শিশুশিক্ষা ভাগত্রয় রচনা করেন। প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা তিনি বেথুন্ সাহেবকে উৎসর্গ করেন সেই উৎসর্গ পত্রটী সাধারণের জ্ঞাপনার্থ এখানে সমুদ্ধৃত হইল।

মহামহিম মান্যবর শ্রীযুত জে, ই, ডি, বীটন
ভারতবর্ষীয় রাজসমাজসদস্য
শিক্ষাসমাজাধিপতি মহাশয়েষু।

সমুচিতসম্মানপুর্ব্বক-সবিনয়-নিবেদনম্

অনেকেই অবগত আছেন, প্রথম পাঠোপযোগি পুস্তকের অসদ্ভাবে অস্মদ্দেশীয় শিশুগণের যথানিয়মে

স্বদেশ ভাষাশিক্ষা সম্পন্ন হইতেছে না। আমি সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে যে পুস্তকপরম্পরা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই কয়েকটি পত্র দ্বারা তাহার প্রাথমিক সূত্রপাত করিলাম।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কি ছোট কি বড়, গ্রন্থকারমাত্রেই আপনার গ্রন্থ, যত তুচ্ছ হউক না কেন, কোন মহানুভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামানুগৃহীত করিয়া লোকসমাজে প্রচারিত করিয়া থাকেন। এই বিশ্বজনীন ব্যবহার দর্শনে বাসনা হইয়াছে, আমারও পুস্তক সকল আপনকার নামাক্ষরসংযুক্ত হইয়া প্রচারিত হয়।

আপনি শিক্ষাসমাজে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া অস্মদ্দেশীয় লোকের বিদ্যা, বিনয়, শীল, সুনীতি সম্পাদনার্থে যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, বিশেষতঃ এতদ্দেশের হতভাগ্য নারী-গণের দুরবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অজ্ঞানান্ধকূপ হইতে তাহাদের উদ্ধার করিবার মানসে যে অশেষ প্রয়াস পাইতেছেন, আমি আপনার সেই সমস্ত বিশুদ্ধ গুণে মুগ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আপনকার সুপ্রতিষ্ঠিত-নাম-সংযোজন-সাহসে প্রবৃত্ত হইলাম। ইহাতে যদি আমি অনুযোজ্য হই, ভাবিয়াছি আপন-কার মহানুভব স্বভাব ও অলোকসামান্য গুণগ্রাম আমার পক্ষে সপক্ষতা করিবেক সন্দেহ নাই।

আহা! কি মনোহর পদবিন্যাস! ১৮৪৭খৃঃঅব্দে যখন বঙ্গভাষার দুরবস্থার পরিসীমা ছিলনা, যখন বঙ্গভাষা কি রূপে পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করিতে হয় তাহা লোকে জানিত না, তখন আর কাহার লেখনী হইতে এরূপ অমৃতধারা নিঃসৃত হইয়াছিল? যখন বঙ্গভাষা প্রলয় নিদ্রায় অভিভূত ছিল তখন আর কে এরূপ পুস্তক-পরম্পরা-লিখনোদ্যম-সাহসে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন? শোচ্যা বঙ্গভাষা! যে তাহার পিতা শিক্ষাবিভাগ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহার বিভাগে বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হন। আহা! তাহা না হইলে বঙ্গভাষা এত দিন কত রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইত। বস্তুতঃ ও বঙ্গভাষা তাঁহার যেরূপ প্রিয়ছিল, বঙ্গভাষার দুরবস্থাপনয়নে তিনি যেরূপ দৃঢ় সংকল্প ছিলেন, তাহা বাসবদত্তার প্রথমাংশের বন্দনাদির রচনা কৌশল দর্শন করিলে বিলক্ষণ জানিতে পারা যায়। সেরূপ পদযোজনা-ক্ষমতা দেখিলে, বোধ হয় তিনি সংস্কৃত কবিতা অতি সুন্দর ও অতি মধুর ভাবে লিখিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে প্রয়াস না করিয়া নিতান্ত অনুন্নতাবস্থা বঙ্গভাষার উন্নতি সম্পাদনে

উদ্যত হইয়াছিলেন। সে পদযোজনা-প্রণালী অধুনাতন লোকদিগের বিশেষ চিত্ত-হারিণী নয়, অথচ সংস্কৃতে তাহা সমধিক গুণোপধায়িনী হইত কিন্তু তিনি তাহা লিখিয়াছেন, সে পদ-যোজনা-কৌশল বঙ্গভাষায়ই দেখাইয়াছেন। অথচ সেই দোষও তিনি স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছিলেন। সে সব কেন? এই হতভাগ্য তৎকালে অপকৃষ্ট-দশাপন্ন বঙ্গভাষারই জন্য। বঙ্গভাষার শোচনীয় দুরবস্থা দর্শনে তিনি তাহা উন্মোচন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শুদ্ধ বঙ্গভাষারই কেন? এই উৎসর্গ পত্রটী পাঠ করিলে এতদ্দেশের হতভাগ্য নারীগণের ও দুরবস্থা দর্শনে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের হৃদয় যে নিরতিশয় ব্যথিত হইত তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান্ হইতেছে। তিনি স্ত্রীজাতির শুদ্ধ শিক্ষা বিধান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন এরূপ নহে, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। তিনি যে শুদ্ধ এরূপ ইচ্ছা করিতেন এমন নয়, তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যেও পরিণত হইত।

শিশুশিক্ষা তিন খানির রচনা এরূপ মধুর ও সরল যে বঙ্গভাষায় বালকবালিকাদিগের পাঠোপযোগি ঈদৃশ পুস্তক আর দেখিতে পাওয়া যায় না। শিশুশিক্ষার অনুবর্ত্তনে এখন শিশুগণের পাঠোপযোগি যে সকল পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে বিনির্গত হইতেছে তাহার এক খানি ও সরলতায় ও মাধুর্য্যে অনুকৃত গ্রন্থের সদৃশ হয় নাই। বরং দুই একখানি এরূপ দুরূহ-শব্দ-সংঘটিত যে তৎ-পাঠে শিশুগণের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত না হইয়া বরং নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

তর্কালঙ্কার মহাশয় যদি শুদ্ধ প্রথমভাগ শিশুশিক্ষা লিখিয়া যাইতেন তাহা হইলে ও তিনি জগতে সুকবি বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিতেন। পাঠকগণ! দেখুন্ দেখি——

(পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল॥ ইত্যাদি।)

বঙ্গভাষায় এরূপ কবিতা কি আর লিখিত হইয়াছে? ইহা পাঠ করিলে আপনাদের রমণীয় বাল্যকাল আবার চিত্রপটে কি অঙ্কিত হয় না, আবার আপনাদের মনে কি স্নেহ

বাল্যকাল-সুলভ মনোহর ভাবের সঞ্চার হয় না? তিনি যে স্বাভাবিক কবিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন হই৷ কি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে না?

দ্বিতীয়ভাগ শিশুশিক্ষায় প্রত্যেক সংযুক্ত অক্ষরের উদাহরণ স্বরূপ যে সকল উপদেশ বাক্য বিন্যস্ত হইয়াছে সেই সকল সুকুমারমতি শিশুগণের কোমল হৃদয়ে গুরূপদিষ্ট নীতি-মালার ন্যায় আশৈশব বদ্ধমূল হইয়া থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা পাঠে শিশুগণ বিদ্যারম্ভের কঠোরতা কিছুই অনুভব করিতে পারে না। বরং এরূপ সরল কবিতামালা পড়িতে তাহাদের নবীনহৃদয় আনন্দে পুলকিত হইতে থাকে। সুতরাং বিদ্যাশিক্ষায় তাহা-দের ভূয়ান্ অনুরাগ জন্মে। বিদ্যামন্দিরে প্রবিষ্ট হওয়ার এরূপ সহজ উপায় সত্ত্বে অতি কঠোর উপায় কেন অবলম্বিত হইতেছে বলিতে পারিনা। পুস্তকের গুণাগুণ বিচার না করিয়া শুদ্ধ নামে মুগ্ধ হওয়া বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়কদিগের উচিত নহে। তৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষা কি অভি-প্রায়ে রচনা করেন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহা

তৃতীয়ভাগের মুখবন্ধে স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয়ভাগে অতি ঋজু ভাষায় নীতিগর্ভ নানাবিষয়ক প্রস্তাব সকল সঙ্কলিত হইল। কেবল মনোরঞ্জনের নিমিত্ত শিশুগণের উন্মেষোন্মুখ নির্ম্মলচিত্তে কোন প্রকার কুসংস্কার সঞ্চারিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। এনিমিত্ত হংসীর স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব, শৃগাল ও সারসের পরস্পর পরিহাস নিমন্ত্রণ, ব্যাঘ্রের গৃহদ্বারে বৃহৎ পাকস্থালী ও কাষ্ঠভার দর্শন ভয়ে বলীবর্দ্দের পলায়ন, পুরস্কার লোভে বক কর্ত্তৃক বৃকের কণ্ঠবিদ্ধ অস্থিখণ্ড বহিষ্করণ, ধূর্ত্ত শৃগালের কপট স্তবে মুগ্ধ হইয়া কাকের স্বীয়-মধুর-স্বর-পরিচয়-দান প্রভৃতি অসম্বদ্ধ অবাস্তবিক বিষয় সকল প্রস্তাবিত না করিয়া সুসম্বদ্ধ নীতিগর্ভ আখ্যান সকল সম্বদ্ধ করা গেল।

এই মুখবন্ধটী পাঠ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি গভীর মানব-হৃদয়-তত্ত্ব-বিৎ ছিলেন। কিরূপে শিশুগণের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হয় তাহা তিনি বিশেষরূপে জানিতেন। বঙ্গবাসিগণ সহজেই অতিশয় কল্পনাশক্তি-প্রবণ, তাহাতে যদি বাল্যাবস্থা অবধি তাহারা কাল্পনিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনা সকলে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের কল্পনাশক্তি অনৈসর্গিক

উত্তেজনা পাইয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে, ইহা তিনি সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তৃতীয় ভাগের গল্প-গুলি বাল্যকালে যখন পড়িতাম তখন মনে কতই নব নব ভাবের উদয় হইত বলিতে পারিনা। অদ্যাপি ও সেই সরল গল্পগুলির মধুরতা ভুলিতে পারি নাই।

শিশুশিক্ষাত্রয়-রচনাতে বেথুন্ সাহেব তর্কালঙ্কারের উপর এত প্রীত হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার উপকার করিবার জন্য সতত ব্যগ্র থাকিতেন। একদা বেথুন্ সাহেব তর্কা-লঙ্কারকে বলিলেন "মদন! তোমার শিশুশিক্ষা রচনায় আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। আমি তোমার কোন উপকার করিতে ইচ্ছা করি। বল কি উপকার করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও"। তর্কালঙ্কারের উন্নত ও তেজস্বীমন ইহা সহিতে পারিল না। তিনি উত্তর করিলেন "মহাশয়! আপনি বিপুল জলধি পার হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গকামিনীগণের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তন্মোচনের চেষ্টায় এই বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন। আমি বঙ্গবাসী। বিদেশীয় মহাত্মা আমা-

দের দেশীয় রমণীগণের দুরবস্থা মোচনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আমি তাঁহার চেষ্টার সাহায্যমাত্র করিয়াছি। ইহাতে আমি কিসে পুরস্কারের যোগ্য ?”। বেথুন্ সাহেব লজ্জিত হইয়া আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু প্রকারান্তরে তর্কালঙ্কারের উপকার করা তাঁহার দৃঢ়সংকল্প রহিল। বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার নিমিত্ত তিনি তর্কালঙ্কারকে বেতন লইতে অনুরোধ করিলেন। তর্কালঙ্কার তাহাতে সম্মত না হইয়া পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সেই পদ প্রদান করিলেন। বেথুনের উদ্দেশ্য বিফল হইল। ইতিমধ্যে সংস্কৃতকালেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইল। এরূপ শুনিতে পাই বেথুন্ তর্কালঙ্কারকে এই পদ গ্রহণে অনুরোধ করেন্। তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পদের যোগ্যতর বলিয়া বেথুনের নিকট আবেদন করায়, বেথুন্ সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইলেন। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয় তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে তর্কালঙ্কারের ন্যায় সদাশয়, উদারচিত্ত ও বন্ধু-হিতৈষী ব্যক্তি অতি কম ছিলেন। হৃদয়ের

বন্ধুকে আপন অপেক্ষা উচ্চতর পদে অভি-
ষিক্ত করিয়া তর্কালঙ্কার বন্ধুত্বের ও ঔদার্য্যের
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

তর্কালঙ্কার স্বভাবতঃ উদরাময়-রোগ-প্রবণ
ছিলেন। কলিকাতা তৎকালে অতি জঘন্য
স্থান ছিল। বহুকাল কলিকাতায় থাকাতে
তাঁহার পীড়া ক্রমে অচিকিৎস্যভাব ধারণ
করিতেছিল। তিনি তিন বৎসরকাল সংস্কৃত-
কালেজে অবস্থিতি করিতেছিলেন এমন সময়ে
মুর্শিদাবাদের জজ্পণ্ডিতের পদ শূন্য হয়।
তর্কালঙ্কার কলিকাতায় থাকিয়া অতিশয়
ক্ষীণবল হইয়াছিলেন, এইজন্য তিনি স্থান-
পরিবর্ত্তন-মানসে বেথুনের নিকট ঐ পদে অভি-
ষিক্ত হওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করেন। বেথুন্
সাহেব তর্কালঙ্কারের জন্য লেফটেনেণ্ট গবর্ণরকে
এতদূর অনুরোধ করিয়াছিলেন যে লেফটেনেণ্ট
গবর্ণর পূর্ব্বেই তৎপদে নিয়োজিত এক
ব্যক্তিকে কর্ম্মান্তরে নিয়োগ করিয়া তাঁহাকেই
সেইপদে প্রতিনিবেশিত করেন। তর্কা-
লঙ্কার ১২৫৭ সালে মুরশিদাবাদে যাত্রা
করেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই তাঁহার
সুবিখ্যাত নাম মুরশিদাবাদের সর্ব্বত্র প্রতি-

ধ্বনিত হইয়াছিল। তিনি মুরশিদাবাদে পৌঁছিয়া চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় সর্ব্বত্র সমাদরে পরিগৃহীত হইলেন। তাঁহার মনোহর মূর্ত্তি, মধুর বচন ও গভীরবুদ্ধি আবালবৃদ্ধ সকলেরই নিকট তাঁহাকে প্রিয় করিয়াছিল। জজ্, ম্যাজিষ্ট্রেট্, কলেক্টর সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তদ্দত্ত ব্যবস্থা কেহই খণ্ডন করিতে পারিতেন না। তর্কালঙ্কারের বক্তৃতা শক্তি মুর্শিদাবাদে প্রথম বিকসিত হয়। তিনি মুরশিদাবাদে বহুল সভা সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং বক্তৃতা করিয়া দেশের হিতার্থে লোকের মন বিনত করিতেন। বিধবা ও অনাথ বালকবালিকাদিগের জন্য মুরশিদাবাদে তিনি এক দাতব্যসভা সংস্থাপন করেন। অদ্যাপিও অনেক বিধবাও দরিদ্রবালক বালিকারা সেই দাতব্য সভা হইতে জীবিকা প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি মুরশিদাবাদে একটি অতিথিশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় কাণ খঞ্জ প্রভৃতিরা অন্নাচ্ছাদনাদি প্রাপ্ত হইত। পাঠকগণের মনে করিয়া দেখা উচিত যে এরূপ দাতব্য সভা ও অতিথিশালাদি সাধারণ্যে সংস্থাপন করার প্রথা পূর্ব্বে বড় প্রচলিত ছিল না।

সুতরাং তর্কালঙ্কারকে ঐ সকল সাধারণ হিতকরী প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা বলিলেও বলা যাইতে পারে।

তিনি মুরশিদাবাদে ছয় বৎসর কাল জজ্ পণ্ডিতের পদ অধিকার করিয়া দেখিলেন তাঁহার মনোবৃত্তি সকল উপযুক্ত চালনা অভাবে নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। কারণ তৎকালে হিন্দু-ব্যবহার-বিষয়িণী ব্যবস্থার বিতর্ক উপস্থিত হইলেই জজ্পণ্ডিত প্রধান বিচারপতি কর্ত্তৃক ধর্ম্মাধিকরণে আহূত হইতেন। অন্য সময় জজ্ পণ্ডিতকে গৃহে বসিয়াই কালক্ষেপ করিতে হইত। তর্কালঙ্কার সেই জন্য ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের পদের নিমিত্ত আবেদন করেন এবং মুরশিদাবাদেই ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। পণ্ডিত শ্রী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তর্কালঙ্কার-পরিত্যক্ত জজ্ পণ্ডিতের পদে মনোনীত হন। এই সময় বিধবা-বিবাহের প্রথম আন্দোলন উপস্থিত হয়। শ্রীশ বাবু প্রথম বিধবা-পরিণেতা। তর্কালঙ্কারের সহিত তাঁহার যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। তর্কালঙ্কার তাঁহার বিবাহের সম্পূর্ণ যোগাযোগ করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথম-পরিণীতা বিধবা

যালিকার সংযোজন-কর্ত্তা। ঐ বিধবাবালা, মাতার সহিত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শ্বশুরালয়ে প্রায় সততই গমনাগমন করিত। তাঁহারই বিশেষ প্রযত্নে মাতা ও কন্যা কলিকাতায় প্রেরিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিদ্যালয়ে সর্ব্ব প্রথমে কন্যা সম্প্রদান ও প্রথম বিধবা বিবাহের সাহায্য করায়, স্বদেশীয় লোকের বিশেষ-বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। অধিক কি এই দুই কার্য্যের নিমিত্ত তিনি ৮। ৯ বৎসর সমাজচ্যুত ছিলেন। যে সমাজ সংস্কারক বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রথম সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, এবং যিনি তজ্জন্য আজীবন সমাজ কর্ত্তৃক উপক্রুত হইয়াছেন, সেই মহাত্মা আমাদের পরম-ভক্তিভাজন সন্দেহ নাই।

তর্কালঙ্কার যৎকালে মুরূশিদাবাদে অবস্থিতি করেন তখন তাঁহার পরম বন্ধু মহাত্মা বেথুনের মৃত্যু হয়। বেথুনের শোকে তর্কালঙ্কার নিতান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। তিন দিন তিনি অবিশ্রান্ত রোদন করিয়াছিলেন। বেথুনের মৃত্যু তর্কালঙ্কারের হৃদয়ে শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা হইতেই পারে। বেথুন্ তর্কালঙ্কারকে যেরূপ ভাল বাসিতেন

এরূপ ভালবাসা বিদেশীয় ও স্বদেশীয়ের মধ্যে প্রায় ঘটেনা। তিনি তর্কালঙ্কারের কন্যাদ্বয়কে আপনার কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। তাহা-দিগকে দেখিলে তিনি আহ্লাদে পুলকিত হইতেন। তিনি প্রায়ই স্বভবন গমনকালে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উভয় কক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয়াবাসে লইয়া যাইতেন। তাহা-দের বালিকা-সুলভ জুগুপ্‌সিত অত্যাচার সকল তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক সহ্য করিতেন। ভুবনমালা ও কুন্দমালা বেথুনের এতদূর স্নেহভাজন হওয়াতে লেডি ড্যালহাউসি প্রভৃতি ও তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। বেথুন্‌ এরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন যে তর্কালঙ্কারের গুণগ্রাম তিনি কখনই ভুলিতে পারেন নাই। তিনি এক সময় কোন কার্য্যোপলক্ষে তর্কালঙ্কারের বিষয়ে তাঁহার এরূপ মত প্রকাশ করেন যে "He will never require service but service will ever require him" তিনি কখন কার্য্যপ্রার্থী হইবেন না কিন্তু কার্য্য সততই তৎপ্রার্থি রহিবে। এরূপ বন্ধু বিয়োগে তর্কালঙ্কারের যে এতদূর কষ্ট হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

তর্কালঙ্কার মুরশিদাবাদে এক বৎসর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে অধিরূঢ় ছিলেন। তাহার পর তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়াতে শরীরের স্বাস্থ্য পুনঃ সংস্থাপনের নিমিত্ত তিনি ময়ূরাক্ষী-নির্ঝরিণী-তীরবর্ত্তি-কান্দীনগর যাত্রার অভিলাষ প্রকাশ করেন। মুরশিদাবাদের জজ্, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে তর্কালঙ্কারের নিমিত্ত কান্দীতে নূতন মহকমা সংস্থাপনের অনুরোধ করেন। বেঙ্গল্ গবর্ণমেণ্ট্ তদনুসারে তর্কালঙ্কারকে কান্দীতে প্রথম ডেপুটী মাজিষ্টেটের পদে নিযুক্ত করেন। গবর্ণমেণ্ট এরূপ অনুগ্রহ আর অতি অল্প লোকের প্রতি করিয়াছেন।

কান্দী তর্কালঙ্কারের কীর্ত্তির চরমস্থান। কান্দীতে তিনি যৎকালে প্রথম আসেন তখন সেখানে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতি কিছুই ছিলনা। তিনি আসিয়া এই সকলের প্রথম সৃষ্টি করেন। মুরশিদাবাদের ন্যায় কান্দীতে ও একটী অনাথমন্দির সংস্থাপন করেন। কত দীন দরিদ্র তাঁহার দাতব্যে জীবন ধারণ করিত বলা যায় না তিনি অনাথদিগের মা বাপ ছিলেন। কত কত পরিত্যক্ত বালক বালিকাকে তিনি পথ হইতে

কুড়াইয়া লইয়া গৃহে আনিয়া স্বীয়যত্নে প্রতি পালিত করিতেন। বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় স্বীয় দুহিতাগণ ও অপর অপর লোকের কন্যারা বিদ্যাশিক্ষা করিত। তিনি স্বয়ং এই বিদালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। ইহা ভিন্ন কান্দীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ও ইনি স্থষ্টিকর্ত্তা। তর্কালঙ্কারের মনুষ্য-প্রেম মানবজাতির জীবদ্দশাতেই পর্য্যবসিত হইত এরূপ নয়; প্রাণাপগমে ও ইহা সহচরের ন্যায় তাহাদিগের অনুগমন করিত। দীন দরিদ্রেরা অর্থাভাবে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিরও মৃতদেহ অযথাস্থানে নিক্ষেপ করিয়া যাইত। তিনি শকুনী গৃধিনী প্রভৃতির করাল-কবল হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য স্বব্যয়ে তাহাদের অগ্নি-সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

কান্দীতে কিছুদিন অবস্থিতির পর তর্কালঙ্কার শুনিলেন যে মাকালতোড় নামক স্থানে একটী কৃত্রিম যুদ্ধ হইবে। ঐ স্থানে দুই দুর্দ্দান্ত মুসল্‌মান্‌ জমিদার ছিল। বিশেষ পর্ব্বাহ উপলক্ষে ঐ দুই রাজার সেনাদল

গ্রামের নিকটবর্ত্তি প্রান্তরে সমবেত হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। ঐ যুদ্ধে প্রতিবৎসর অনেক লোক হত ও আহত হইত। এই প্রথা বহুকাল অবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। একবার একজন ইংরাজ মেজিস্ট্রেট্ ইহা নিবারণ করিতে গিয়া হত হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তথাপি ও স্থির করিলেন যে এই যুদ্ধ প্রতিরোধ করিবেন। কারণ প্রতিবৎসর এত নরহত্যা উপেক্ষা করা রাজপ্রতিনিধির উচিত নয়। তিনি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধনকে প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয়তর মনে করিতেন। সেইজন্য তিনি মনে করিলেন যে তিনি যে পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কর্ত্তব্য শান্তিরক্ষা, সেই কর্ত্তব্য সাধন জন্য প্রাণের ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন। প্রিয়তম আত্মীয় পরিজনের ক্রন্দন ও শতশত অনুরোধ না মানিয়া যুদ্ধের দিন তিনি পুলিস সৈন্য সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইলেন। এই অশ্বটী যুদ্ধের অশ্ব। সে উভয়সৈন্যকে রণসজ্জায় সজ্জিত দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বল্‌গাকৃষ্ট হই-

য়াও বেগে সেনাব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিল। পুলিস সৈন্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের অনুবর্ত্তন করিতে সাহস করিল না। কেবল হরিসিংহ নামক একজন প্রভু-পরায়ণ দ্বারবান্ প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইল। অশ্ব উভয়দল সেনার মধ্যে প্রবেশ করিল। ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট্‌কে মধ্যবর্ত্তী দেখিয়া উভয়দলই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ঘোটক পদদেশে আঘাত পাইয়া ভূতলে পতিত হইল। অশ্বের পতনবেগে আরোহীও ভূপতিত হইলেন। প্রভু-পরায়ণ ভৃত্য অমনি, নিজ শরীর দ্বারা স্বামীর শরীর, ও চর্ম্মদ্বারা তাঁহার মস্তক, আবরণ করিল। ভৃত্য আহত হইল। প্রভু মূর্চ্ছিত রহিলেন, সেনারা পলায়ন করিল। তাহারা পলায়ন করিলে, পুলিসের লোকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্‌কে নিকটবর্ত্তী কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে লইয়া গেল। তথায় গিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইল। কিন্তু তাঁহার মন একবারে ভগ্নোদ্যম হইল। ভাবিলেন, যে, এরূপ দুর্দ্দান্ত জমিদারেরা রাজপ্রতিনিধিকে আক্রমণ করিয়াও যদি নিষ্কৃতি পায়, তাহাহইলে ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে এ প্রদেশে লোকের বাস

করা দায় হইবে। তিনি রাজপ্রতিনিধি হইয়া যদি তাহাদিগকে শাসন করিতে না পারেন তবে আর কে করিবে, এই ভাবিয়া তাঁহার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইল। তিনি কিছু সুস্থ হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। দুই এক দিন বাটী থাকিয়াই লোক জন সমভিব্যাহারে মাকালতোড়ে পুনরায় আগমন করিলেন। তথায় অপরাধিদিগকে ধৃত করিয়া তাহাদিগকে আদালতে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু জমিদারদিগের এরূপ শাসন যে কেহ সত্য সাক্ষ্য দিল না, এজন্য বিশেষ প্রমাণাভাবে অপরাধিরা উচ্চবিচারালয়ে মুক্তিলাভ করিল। তর্কালঙ্কার এই ঘটনায় নিরতিশয় কাতর হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "আজ আমার অর্দ্ধ মৃত্যু হইল।" তিনি এখন হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন, যে, যত শীঘ্র পারেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। কারণ এরূপ দুর্দ্ধর্ষ জমিদারেরা যখন উচ্চ আদালত হইতে এরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইল, তখন তাহারা তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত ও সংহার করিতে চেষ্টা করিতে পারে ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ সে স্থলের শান্তি রক্ষা করা তাঁহার প্রধানতম

উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য ছিল। জমিদারেরাই সেইরূপ যুদ্ধের ও নর হত্যার মূলীভূত কারণ ছিল। এক্ষণে তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া আরও প্রশ্রয় পাইবে, আরও দুর্দ্দান্ত হইবে। শান্তি সেখানে কখনই রক্ষিত হইবে না। আবার শান্তিরক্ষার জন্যে সেরূপ ঘটনায় পুনর্ব্বার সেখানে গেলে তাঁহাকে অকৃত কর্ম্মা হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। তিনি দমনের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিলে দেখিলেন তাহাতে তিনি কৃত-কার্য্য হইতে পারিবেন না। কেননা উচ্চ আদালতকে আর তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না—দেখিলেন প্রকৃত প্রমাণাভাবে অসত্য ও রক্ষিত হইতে পারে—দেখিলেন এরূপ স্থলে প্রকৃত প্রমাণের অসদ্ভাব; জমীদারেরা সেখানকার প্রধান লোক, সকলেই তাহাদের বশীভূত। সুতরাং আর তাহাদিগকে দমন করিতে পারিবেন না, দুর্দ্দান্তেরা দণ্ডিত হইল না, এই ভাবিয়াই তিনি নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও দুর্ম্মনায়মান হইলেন, মনে করিলেন, নিশ্চয়ই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন। তিনি পরিবারবর্গের নিকট আপনার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। "জীবনে আর কখন কবিতা

লিখিবনা” এ প্রতিজ্ঞা তাঁহার এখন শিথিলবল হইল। তিনি এক্ষণে স্থির করিলেন যে অন্ততঃ বৃক্ষতলে বসিয়াও কবিতা লিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। তথাপি, এজীবনে, এপদে, এ সম্মানে আর কাযনাই; কিন্তুমৃত্যু তাঁহার সকল সংকল্প বিফল করিল। অপরাধীরা মুক্তি লাভ করাতে তর্কালঙ্কারের মনে নিরতিশয় অপমান বোধ হইয়াছিল। তিনি সেই অবধি স্নান ভোজনাদি অবশ্য কর্ত্তব্য নিত্যকার্য্যে ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। শরীর ও মন দিন দিন নিস্তেজ হইতে লাগিল। এই সময়ে কান্দীতে ওলাউটা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তর্কালঙ্কার ঐ শোচনীয় ঘটনার প্রায় দুই মাস পরে ১২৬৪ সালের ফাল্গুণ মাসের সপ্তবিংশ দিবসে ঐ ভয়ঙ্কর রোগের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন।

কান্দীতে উপযুক্ত চিকিৎসকাভাবে তাঁহার যথারীতি চিকিৎসা হইল না। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর নীলিমা প্রাপ্ত হইল ও কণ্ঠস্বর ভগ্ন হইল। পত্নী-শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতেছিলেন। তিনি গুরু-

শোকে ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। রোগীর পাছে কষ্ট হয় এই জন্য তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে পারিলেন না কিন্তু অনিবার্য্য ধারা তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। চতুর্দ্দিকে কেবল অকুল-দুঃখসাগরের পরিবেশ-মণ্ডল দেখিতে লাগিলেন। দশমবর্ষীয়া বালিকা ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালকের সহিত পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ হন। সেই অবধি তাঁহাদের পরস্পর প্রেম দিন দিন উপচীয়মান হইতেছিল। পূর্ণ বৃদ্ধির সময় এই ভীষণ বিপৎপাত! আশৈশব, কি সম্পদে, কি বিপদে, কি স্বদেশে কি বিদেশে, ছায়ার ন্যায় যে স্বামীর অনু-বর্ত্তন করিয়াছেন, মদনাধিক-সৌন্দর্য্য সেই স্বামী তাঁহাকে অনাথিনী করিয়া অপুনরা-গমনের নিমিত্ত পরলোক গমন করিবেন, একে এই ভাবনায় তাঁহার হৃদয় অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছিল, আবার স্বামীর আদরিণী কিশোরবয়স্কা দুহিতাগণ পিতৃবিয়োগে কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে এই চিন্তায় তাঁহার অর্দ্ধ-দগ্ধ হৃদয় পূর্ণদগ্ধ হইল! অশ্রুযুগলের নীরন্ধ্র-ধারা-পটল-সন্দর্শনে রোগীর মন গলিত হইল। তিনি কাতরস্বরে বলিলেন "তুমি

কেঁদোনা, তোমার চিরসহচর তোমায় ফেলিয়া পলায়ন করিতেছে বটে কিন্তু তাহার প্রাণসখা ঈশ্বর তোমায় সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় আশ্রয় দিবে। তাহার জীবদ্দশায় তুমি ও আমার প্রাণসমা কন্যাগণ কোন কষ্ট পাইবে না। আমার আর এক প্রার্থনা আছে, আমি তোমাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে এই ভিক্ষা চাই যেন আমি প্রশান্তভাবে মরিতে পাই ; মৃত্যুর পূর্ব্বে যেন আমায় শয্যা হইতে মৃত্তিকায় নামান না হয়।”

এই বলিতে বলিতে সেই অমৃতভাষিণী জিহ্বা নিস্তব্ধ হইল। যে রসনা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পত্নী, দুহিতা ; ধনী, দীন সকলেরই কর্ণে সুধাধারা বর্ষণ করিত সেই রসনা এজীবনের মত বাক্যস্ফূরণ-ক্লেশ হইতে অবসৃত হইল। যে মোহন-মদন-মুর্ত্তি আবাল বৃদ্ধ সকলেরই চিত্তহারিণী ছিল, মৃত্যুর করস্পর্শে তাহা আর সেরূপ চিত্তহারিণী রহিল না। দৃষ্টি রহিত হইল। গাত্রে যেন কে জল ঢালিয়া দিল। চতুর্দ্দিকে রোদন ধ্বনি উঠিল। সমুদায় কান্দী নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল।

পিতাকে মৃত্যু শয্যায় শয়ান দেখিয়া

পিতৃ-সোহাগিনী শিশু কন্যাগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। তাহাদের রোদনে পশু পক্ষীর ও চক্ষু হইতে শোকাশ্রু নির্গত হইল। শয়নে, অশনে ও ভ্রমণে যাহারা পিতা বই আর কিছুই জানিত না সেই আদরিণী বালিকারা আজ পিতৃবিয়োগিনী হইল! কে আর তাহাদিগকে সেরূপ পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিবে? বঙ্গাঙ্গনাদের আদর আর কে বুঝিবে? তাহাদের শোচনীয় অবস্থা-দর্শনে আর কাহার হৃদয় দগ্ধ হইবে? বঙ্গীয় রমণীগণ! তোমাদের পরমবন্ধু আজ সংসার লীলা সম্বরণ করিলেন। এখন কি তোমরা নিশ্চিন্ত ও উদাসীন থাকিবে? এস সকলেই শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করি। এদিকে পত্নী ধরাশয্যায় শয়ান। ঘন ঘন বিবর্ত্তনে তাঁহার অঙ্গ ধূলি-ধূষরিত ও কেশপাশ আলুলায়িত হইতেছিল। কে তাঁহায় সান্ত্বনা দিবে? কি বলিয়াই বা সান্ত্বনা দিবে? এ অকুল বিপদ্‌সাগরের কুল কে দেখাইয়া দিবে? এমন কর্ণধার কে আছে? যে মোহনকান্তি পূর্ব্বে দেখিবামাত্র হৃদয় ও মন আনন্দে পুলকিত হইত সেই মোহনকান্তির

মোহিনীশক্তি এখন অন্তর্হিত হইল! এক্ষণে ইহা দেখিবামাত্র কেবল শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠে। সেই শোচনীয় দৃশ্য অধিকক্ষণ আর কে দেখে? তাঁহার আস্থান ময়ূরাক্ষীর তটেই। যে ময়ূরাক্ষীর সুস্নিগ্ধ সমীরণ তর্কালঙ্কারের শ্রান্ত শরীর সুশীতল করিত, যাহার কাকচক্ষু-সদৃশ জল পান করিয়া স্বাস্থ্য পুনঃ সংস্থাপন করিবেন বলিয়া তর্কালঙ্কার মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই প্রিয়তমা ময়ূরাক্ষীর ক্রোড়ে তিনি অনন্তনিদ্রায় অভিভূত রহিলেন। যিনি বঙ্গভাষার জীবন প্রদান ও বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত করিয়াছেন সেই মহাত্মা ময়ূরাক্ষীতীরে অজ্ঞাতবাসে চির নিদ্রা যাইতেছেন, বঙ্গবাসিগণ অনেকেই ইহা অবগত নন্। যদি উপকারকের প্রত্যুপকার করা উচিত হয় তবে বঙ্গবাসিগণ! আসুন্ আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় নাম বঙ্গের চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করি।

জ্যেষ্ঠাকন্যা ভুবনমালা পিতার সহিত ঐ করাল রোগে আক্রান্ত হন্। তিনি এই সময়ে পূর্ণগর্ভা ছিলেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর ও একদিন কি দুই দিন জীবিত ছিলেন।

কিন্তু তিনি এরূপ পিতৃপরায়ণা ছিলেন যে পিতার মৃত্যুর পর একমুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। পিত্রনুগমন তাঁহার স্থিরসংকল্প হইল। সুচিকিৎসার জন্য তাঁহাকে কান্দী হইতে বহরমপুরে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু বহরমপুর আসিয়াই তিনি কলেবর পরিত্যাগ করেন।

তর্কালঙ্কার সহধর্ম্মিণীকে তিনমাস অন্তঃসত্বা রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। এই গর্ভে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ ৮ কন্যা ও তিন পুত্র হইয়াছিল। আক্ষেপের বিষয় যে তিন পুত্রও দুই কন্যা শৈশবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করে। অবশিষ্ট ছয়কন্যার মধ্যে পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে জেষ্ঠা পিতার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। এক্ষণে পাঁচ কন্যামাত্র জীবিত আছেন। তর্কালঙ্কার কন্যাদ্দিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। কেহ কন্যা বলিয়া ঘৃণা করিলে তিনি তাহা সহিতে পারিতেন না। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁহাদ্দিগের যথাবিধি শিক্ষাবিধান করিতেন। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" কন্যাশিক্ষা-বিধায়িনী এই

নীতির সার্থকতা প্রথমে তিনিই সম্পাদন করেন। কন্যাগণ রূপে ও বুদ্ধিতে পিতৃসদৃশা। পিতার অকালমৃত্যু না হইলে, বোধহয়, তাঁহারা এতদিন বিদ্যা ও গুণে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিতেন। তাঁহার এক্ষণকার তৃতীয়কন্যা যে পিতৃসম্বন্ধিনী কবিত্ব-শক্তির কিঞ্চিৎ ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। পাঠকগণ তাঁহার রচিত নিম্ন লিখিত পদ্যটী পাঠ করিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন।

" করিতে পদ্যরচনা, হতেছে মনে বাসনা,
কিন্তু কেমনে রসনা করিবে বর্ণন ?
ইচ্ছা হয় সযতনে, গাঁথি কাব্য, সাধুজনে
ভক্তি সহ করিতে প্রদান।
কেমনে রচিব হায়! সহজে অবলা তায়,
নাহি কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞানের প্রভাব।
নাহি মম বোধোদয়, কিসে হবে বোধোদয় ?
যেগুণে লিখিব কাব্য, তাহার অভাব।
নাহি জানি অলঙ্কার, কি দিয়া গাঁথিব হার,
যাহে সুধীজন-মন করিব হরণ ?
ন্যায়ে নাহি অধিকার, কেমনে করি বিচার,
যাহে ভাল মন্দ পারি করিতে বর্ণন।

বিপিনে কুরঙ্গীচর, বৃথা মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
জলভ্রমে মরু যথা করয়ে ভ্রমণ।
সেই মত মম আশ, না হইবে পরকাশ,
ভাবি তাই; ভেবে তাই কাঁদি অনুক্ষণ ॥
দয়াময় কৃপাগুণে, করুণা প্রকাশ দীনে,
সুপ্রভাত কর আজি যাম ॥
কোথা দেবি বীণাপাণি! ও চরণ হৃদে আনি,
নানামতে করিগো বন্দন।
কোথা গো শরদাননে! বাক্যদান কর দীনে,
তব পদে এই নিবেদন ॥
বিতর করুণা-কণা, যেন না হই বঞ্চনা,
সুধাদানে ক্ষুধা মম হর।
করিব গ্রন্থ সূচনা, ক'রোনাকো প্রবঞ্চনা,
ধর মম ক্ষুদ্র উপহার ॥"

যদিও এই রচনাটী এখানে উদ্ধৃত করা নিতান্ত সমীচীন নহে তথাপি তাঁহার অদ্ভুত স্ত্রীশিক্ষা-কৌশল,দেখাইবার জন্যই এটী এখানে দেওয়া গেল।

দেখুন্, অষ্টাদশবর্ষীয়া বালা এরূপ অশিক্ষিত অবস্থায় যখন এমন কবিতা রচনা করিয়াছেন, তখন যে তিনি পিতার স্বাভাবিকী কবিত্ব শক্তির কিছু অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অন্যান্য কন্যাগণ বিশেষতঃ

বর্ত্তমান দিগের মধ্যে জেষ্ঠা কন্যা ও উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিতে অক্ষমা নন্। বিশেষ বাহুল্য ভয়ে এখানে আর ইঁহাদিগের রচনা দেওয়া গেলনা।

তর্কালঙ্কারের কনিষ্ঠভ্রাতা গোপীমোহন ও কলিকাতা সংস্কৃতকালেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি ও অতি ধীরবুদ্ধি ছিলেন। কিন্তু দুরন্ত ওলাউটারোগ অতি অল্পবয়সেই তাঁহার প্রাণসংহার করে। সুতরাং তর্কালঙ্কার পতিহীনা জননীর একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। কান্দীতে তাঁহার যৎকালে মৃত্যু হয় তখন তাঁহার অভাগিনী মাতা স্বদুহিতৃগণ সমভিব্যাহারে বিল্লগ্রামে বাস করিতেছিলেন। বহরমপুর হইতে বিল্লগ্রামে প্রত্যাগত পুত্রবধূর রিক্তহস্ত তাঁহাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে ফেলিয়া দিল। তাঁহার একমাত্র অন্ধের যষ্টি কে হরিয়া নিল? একমাত্র-পুত্রশোককাতরা বৃদ্ধা জননীর হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদে পাষাণ ও দ্রবীভূত হইয়াছিল। তর্কালঙ্কার ভগিনীগুলিকে প্রায় স্বহস্তেই প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে এত ভাল বাসিতেন যে তাঁহাদের অনভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে কখন শ্বশুরালয়ে

পাঠান্ নাই। ভগিনীপতি দিগকে বাটী আনিয়া তাঁহাদের ক্ষমতানুসারে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় বিধান করিয়া দিতেন। সুতরাং ভগিনীরা ভ্রাতৃবিয়োগে যে শুদ্ধ ভ্রাতৃবিহীনা হইলেন এরূপ নয়; তদ্বিয়োগে তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় ও নিরাশ্রয় হইলেন।

গুরুব্যবসায়োপজীবী বিল্লগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তর্কালঙ্কারের উচ্চাশয়তা কিছুই অনুভব করিতে পারেন নাই। তিনি অধুনা-প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ-শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না বলিয়া তাঁহারা গ্রামের হিতকরী তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল করিতেন। তর্কালঙ্কার বিল্লগ্রামে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার পরমবন্ধু বেথুন্ শিক্ষা-সমাজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তর্কালঙ্কারের অনুরোধে তিনি কি না করিতে পারিতেন? প্রত্যুত তর্কালঙ্কারের কথামাত্রে বিল্লগ্রামে অপূর্ব্ব বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু ভট্টাচার্য্য-মহাশয়দিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে তর্কালঙ্কার বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া

গ্রামের বালকদিগকে কেবল খৃষ্টান্ করিবেন।
বিল্লগ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপনের যৎকালে
প্রথম আন্দোলন হয় তখন পণ্ডিতাগ্রগণ্য
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভারতবর্ষীয় ডিমস্থেনিস্
মৃত মহাত্মা বাবু রামগোপাল ঘোষ, সুধীবর
মৃতমহাত্মা তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তর্কা-
লঙ্কারের বন্ধুবর্গ বিল্লগ্রামনিবাসী পণ্ডিতগণকে
সদ্যুক্তিদ্বারা বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে সম্মত
করিতে বিল্লগ্রামে গমন করেন্। পণ্ডিত
মহাশয়েরা এরূপ কর্কশভাষী ছিলেন যে উক্ত
মহোদয়গণের অন্যতমকে অতি বীভৎসগালি
দিতে ও সঙ্কুচিত হন নাই। উক্ত পণ্ডিতবর্গ
যদি বিল্লগ্রামের বর্ত্তমান দুরবস্থা পর্য্যবেক্ষণ
করিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন
তর্কালঙ্কার বিল্লগ্রামের কতদূর হিতৈষী
ছিলেন। যে তর্কালঙ্কার হইতে বিল্লগ্রামের
নাম চিরস্মরণীয় হইয়াছে, এবং যতদিন বঙ্গে
বিদ্যানুশীলন থাকিবে ততদিন যে তর্কাল-
ঙ্কারের নামের সহিত বিল্লগ্রামের নাম
বঙ্গের চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইবে সেই
তর্কালঙ্কারের মহিমা বিল্লগ্রাম নিবাসী মহো-
দয়েরা কখন অনুভব করিতে পারিলেন না

ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে।

বঙ্গভাষার পরমবন্ধু কবিবর ৺মদন মোহন তর্কালঙ্কারের অমূল্য জীবন-চরিত সমাপ্ত করার পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন এবং পুস্তক সংস্করণও মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত কিছু না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। ১২৫৪ সালে যখন বঙ্গদেশে মুদ্রাযন্ত্র প্রায় ছিল না সেই সময় তিনি সংস্কৃত যন্ত্র নামক অধুনা-সুবিখ্যাত মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপন করেন।

ভারত-রচিত অন্নদামঙ্গল তর্কালঙ্কার দ্বারা সংশোধিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে এই যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, চিন্তামণি-দীধিতি, বেদান্ত-পরিভাষা এই তিন খানি পুস্তকের সংস্করণ ও প্রথম মুদ্রাঙ্কন দ্বারা তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের বিলক্ষণ উপকার করিয়া গিয়াছেন। শব্দশক্তি-প্রকাশিকা ও বোপদেবের ধাতুপাঠ এই দুই খানি ব্যাকরণ গ্রন্থ এবং কাদম্বরী, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত এই তিনখানি সাহিত্যগ্রন্থ সংশোধিত ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কাব্য ও ব্যাকরণ-সংসারে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি-

লাভ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত পুস্তক সকলের সংস্করণ ও মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে তিনি প্রথম পথ-প্রদর্শক। সংস্কৃত ভাষায় অধুনা যে ভূরি ভূরি গ্রন্থ সংস্কৃত ও মুদ্রিত হইতেছে তিনিই তাহার প্রাথমিক সূত্র পাত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি "সর্ব্বশুভকরী" নামে এক অতি অপূর্ব্ব সংবাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন। সর্ব্বশুভকরীর সময় "রসরাজ" ও "প্রভাকর" ব্যতীত বঙ্গভাষায় অন্য সংবাদ পত্র প্রায় ছিল না। রসরাজ ও প্রভাকর গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত। কিন্তু শুদ্ধ গদ্যে সংবাদ পত্র ইহার পূর্ব্বে আর প্রকাশিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। সুতরাং তর্কালঙ্কার এই নব্য আকারে সংবাদ পত্র প্রচলিত করার প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এতদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর প্রণীত বেতাল পঞ্চবিংশতিতে অনেক নূতন ভাব ও অনেক সুমধুর বাক্য তর্কালঙ্কার দ্বারা অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা তর্কালঙ্কার দ্বারা এতদূর সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল যে বোমাণ্ট ও ফ্লেচর লিখিত গ্রন্থগুলির ন্যায় ইহা উভয় বন্ধুর রচিত বলিলে

ও বলা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর রচনা-
বিষয়ে তর্কালঙ্কারের উৎকর্ষ এতদূর অবগত
ছিলেন, যে শকুন্তলা রচনা করিয়া তর্কাল-
ঙ্কারকে উপহার স্বরূপ এক খানি পুস্তক
পাঠাইয়া দিয়া এরূপ লিখিয়াছিলেন যে ভ্রাতঃ!
যদিও ইহা তোমায় উপহার দিবার যোগ্য নয়,
তথাপি আমার এরূপ বিশ্বাস যে বন্ধুর শ্রমের ধন
বলিয়া তুমি অনুপযুক্ত হইলেও ইহাকে অবশ্য সা-
দরে গ্রহণ করিবে। এরূপ লেখকের লেখনী, মুর্-
শিদাবাদযাত্রার পর অবধি কেন নিস্তব্ধভাব ধা-
রণ করিয়াছিল, আমাদের ভাবিতে অতিশয় ক-
ষ্টবোধ হয়। তাঁহার পরিবারবর্গের মুখে শুনিতে
পাই যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এক খানি
বৃহৎগ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়া যান। তাঁহার মৃত্যু-
শোকে তাঁহারা যখন নিতান্ত অভিভূত ছিলেন
সেই সময় সেই গ্রন্থ খানি অপহৃত বা বিনষ্ট হয়।
তর্কালঙ্কারের জীবনের শেষ ভাগের রচনা অতি
চমৎকার হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু দুর্ভাগ্যের
বিষয়, সাধারণে তাঁহার অমৃতময়ী রচনার শেষ
ফল ভোগ করিতে পাইলেন না।

তর্কালঙ্কারের জীবন-চরিতের সহিত তাঁহার
তেজস্বিতা ও ধর্ম্মবিষয়ক বিশ্বাস নিতান্ত

অসম্বদ্ধ নহে। তিনি এরূপ তেজস্বী ছিলেন যে কখন কাহার ও তোষামোদ করিতে পারিতেন না। তাঁহার তেজস্বিতার একটী উদাহরণ দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। যৎকালে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন একদিন একজন সিবিলিয়ান্ অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিয়াছিলেন "পণ্ডিত মহাশয়! আপনি এরূপ বাঙ্গালা কোথা হইতে শিক্ষা করিয়াছেন"? তর্কালঙ্কার উত্তর করিলেন "তুমি জান না, এ বাঙ্গালা আমি বিলাত হইতে শিখিয়া আসিয়াছি?" ধর্ম্মবিষয়ে তর্কালঙ্কারের কিরূপ বিশ্বাস ছিল তাহা স্থির বলা যায় না; তবে কন্যাগণকে একেশ্বরবাদিনী করিবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ চেষ্টা পাইতেন তাহাতে এরূপ অনুমান হয় যে অন্ততঃ কার্য্যতঃ তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তর্কস্থলে তিনি বর্ত্তমান অনিশ্চিত-বাদীদিগের (Sceptics) ন্যায় মত প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বর তত্ত্ববিষয়ে তাঁহার প্রকৃত বিশ্বাস অনির্ণীত থাকিলে ও মনুষ্যজাতির হিতসাধন যে তাঁহার জীবনের এক মাত্র ব্রত ছিল ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

বাসবদত্তা।

৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত বাসবদত্তা স্বাধীন গ্রন্থ নহে। ইহা সংস্কৃত বাসবদত্তা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। সংস্কৃত বাসবদত্তা গদ্য গ্রন্থ। বররুচি, উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন; তাঁহারই ভাগিনেয় সুবন্ধু এই সংস্কৃত বাসবদত্তার রচয়িতা। কাদম্বরী, দশকুমারচরিত ও বাসবদত্তা এই তিন খানি বই সংস্কৃতভাষায় আর অন্য উৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থ দেখা যায় না। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ এই দুই খানিও উৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থ বটে, কিন্তু এই গ্রন্থদ্বয়ের রচনাপ্রণালী পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থত্রয়ের রচনা অপেক্ষা অধিকতর সরল। প্রথমোক্ত তিন খানির রচনা অতি প্রগাঢ়। কাব্যশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে ইহা ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না। তর্কালঙ্কার সংস্কৃত বাসবদত্তার অবিকল অনুবাদ করেন নাই। তাহাহইলে

বাসবদত্তার রচয়িতা বলিয়া কবি-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন না। তিনি বাসবদত্তা-ঘটিত উপাখ্যানমাত্র অবলম্বন করিয়া, নিজেরভাবে, নিজের ভাষায়, নিজের ছন্দে ও নিজের রাগ রাগিণীতে এই কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বিংশবর্ষীয় পাঠদ্দশাপন্ন ছাত্র এত ছন্দ ও এত রাগ রাগিণী শিক্ষা করিয়া তাহাতে এমন সুললিত কবিতামালা কি রূপে রচনা করিলেন তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। তর্কালঙ্কার তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে যে সকল ছন্দ, রাগিণী ও তাল ব্যবহার করিয়াছেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। পাঠকগণ তাহা দৃষ্টি করিলে জানিতে পারিবেন, তর্কালঙ্কার কিরূপ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

ছন্দ।	রাগিণী।	তাল।
১। পয়ার	ভৈরবী	ঠেকা
২। ভঙ্গপয়ার	সিন্ধু	জৎ
৩। অনুষ্টুপ্	বাগেশ্বরী বাহার	ছেপ্‌কা
৪। ত্রিপদী	ভৈরোঁ	আড়াঠেকা
৫। লঘুত্রিপদী	বেহাগ	ঝাঁপতাল
৬। ভঙ্গ-ত্রিপদী	মল্লার	একতালা

৭।	ললিত-ত্রিপদী	বিভাস	ঠুংরি
৮।	দীর্ঘ-ত্রিপদী	আলাইয়া	রূপক
৯।	লঘু-চৌপদী	গৌরসারঙ্গ	তিওট
১০।	তোটক	মেঘমল্লার	খয়েরা
১১।	পজ্ঝটিকা	বারোঁয়া	মধ্যমান
১২।	একাবলী(শুদ্ধ ও হিন্দিমিশ্রিত)	ঝিঁঝিট	মধ্যমানের ঠেকা
১৩।	দ্রুতগতি	সরফরদা	পোস্ত —
১৪।	গজগতি	সুরট্‌মল্লার গজল	একতালা
১৫।	কুসুমমালিকা	জয়জয়ন্তী	তেলনা
১৬।	দিগক্ষরাবৃত্তি	খাম্বাজ	ছোট-চৌতাল
১৭।	লঘু-ত্রিপদী-মধ্যযমক।	কল্যাণ	খেমটা
১৮।	অন্ত্যযমক-পয়ার।	ললিত বিভাস	আড়া
১৯।	দীর্ঘত্রিপদী-যমক।	ঝিঁঝিট আলাইয়া	
২০।	দীর্ঘ-মাল-ঝাঁপ।	মুলতান	
২১।		মালকোষবাহার	
২২।		বাহারপঞ্চম	
২৩।		লুম্‌	
২৪।		টৌড়ি	

এত বিবিধ ছন্দে বঙ্গভাষায় আর অতিঅল্প কবি কবিতা রচনা করিয়াছেন। পয়ার, অনুষ্টুপ্, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী এই কয়েকটী ছন্দই বঙ্গভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি অল্প কবি বিচিত্র কবিত্ব শক্তির সহিত রমণীয় গীতশক্তি বিমিশ্রিত করিতে

সক্ষম হইয়াছেন। গান ও কবিতাগুলি কোন কোন স্থানে শুদ্ধ বাঙ্গালা, সংস্কৃত বা হিন্দীতে রচিত, কোন কোন স্থানে ভাষাদ্বয় বা ভাষাত্রয় সংরচিত। গানগুলি এত সুমধুর যে এস্থলে দুই একটী উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রাগিণী টোরি।——তাল একতালা।

মন হরিণী আমার মন বনে পশিল।
মম ধৈর্য্য তৃণ সব উন্মূলন করিল॥ ধ্রু॥
পাতিয়ে স্বপন পাশ, ধরিতে করিল আশ,
তাহাতে নিদ্রার ফাঁস, অমনি খসিল।

এরূপ প্রসাদ-গুণযুক্ত গভীরভাবব্যঞ্জক গীত বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল-প্রসর। এ ভাবটী তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সম্পূর্ণ স্বকীয়।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

কই এল সই! সেই প্রাণ কালিয়া।
স্মর-শরশরে তনু যার জ্বলিয়া॥
এ বন ফুলের মালা, বিষম শূলের জ্বালা,
এ দেহ বিহনে কালা, যায় বুঝি গলিয়া।
আসিতে যে গেল গেল, পুনঃ নাহি ফিরে এল।
যদি বা আসিতেছিল, কে রাখিল ছলিয়া॥

এটীও প্রসাদগুণে পূর্ব্ব গানটীর নিতান্ত ন্যূন নহে।

প্রভাত বর্ণন।

রাগিণী বিভাস। তাল আড়াঠেকা।

গচ্ছতি রজনী, কোকিল-রমণী কূজতি ভৃশমনুবারং।
বিকসতি কুসুমং, রৌতি চ বিষমং কল-কলমলি-পরিবারং॥
গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিরে, স্ফুটতি চ নলিনী-জালং।
কুমুদ-কলাপে, বিহিত-বিলাপে, সীদতি রহসি বিশালং॥
বিরহিত-শোকে, কূজতি কোকে, হৃষ্যতি বিগত-বিকারং।
সকল-কিশোরী, তৃষিত-চকোরী, রোদিতি সকরুণ-তারং॥
শ্রীকবি-মদনো, ধৃতহরিচরণো, রচয়তি রহিত-বিষাদং।
বিহিত-সুসজ্জাং পরিহর শয্যাং, নৃপসুত! স্মর হরিপাদং॥

অনুপ্রাসালঙ্কার ও প্রসাদগুণ সংঘটিত এরূপ স্বভাবোক্তি-বর্ণন সংস্কৃতকাব্যশাস্ত্রে ও অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুর বন্দনা।

রাগ ভয়রোঁ। তাল ছেপ্‌কা।

ভজন।

কালিয়-মর্দ্দন! কংস-নিসূদন! কেশিমথন! কংসারে!
খগপতিবাহন! খেচর-পালন! খিন্নখলবল-হারে!
গোকুল-গোলোকচন্দ্র! গদাধর! গরুড়বাহন! গিরিধারে!
ঘন-ঘন-ঘুঙ্গুর-ঘোষক! ঘনতনু! ঘোর-তিমির-সংহারে!
চঞ্চল-চম্পক-চারু-চটুলচলচীর! চতুর্ভুজ! চৈদ্যহরে!
ছদ্ম-বামন! ছিন্ন-রাবণ! ছলিত-বলিবল! শৌরে!

জগজ্জন-জীবন! জৈন! জনার্দ্দন! জলদ-জলজ-রুচি-চৌরে!
ত্রিভুবন-তারক! তাপনিবারক! তরুণ-তনু-জিত-তোয়ধরে!
দৈত্যদলবল-দলন! দুঃখ-হর! দুরিতদাহক! দেব! হরে!
নূতন-নীরদ-নীলকলেবর! নন্দনন্দন! নরকারে!
পতিত-পাবন! পরমকারণ! পীত-পটুপট-ধারে!
বল্লব-বালক! বিপিন-বিহারক বংশীবট-তটতীরে।
ভুবন-ভূষণ! ভকতি-ভাজন! ভীরু-ভবভয়-তারে!
মদনমোহন-মনসি মোদন মন্দমধুমুরগান হরে!

এই বন্দনাটী পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট অনুভব হয় যে তর্কালঙ্কারের সংস্কৃত শব্দ গুলির উপর ভূয়সী প্রভুতা ছিল। তাহা দিগকে তিনি যেরূপে সংযোজনা করিতে ইচ্ছা করিতেন সেই রূপেই পারিতেন। তাহারা তাঁহার হস্ত-বিনিয়োজনায় তান-লয়-বিশুদ্ধ গীতি প্রদান করিত। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়বিধ ভাষাতেই এরূপ কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিতে কবিবর ভারতচন্দ্র ব্যতীত আর কেহই সক্ষম হন নাই। তর্কালঙ্কার সংস্কৃতভাষায় এরূপ অশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে তিনি মাতৃভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতভাষায় উৎকৃষ্টতর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন।

" শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ॥"
নির্ব্বেদ-স্থায়িভাবোঽস্তি,
শান্তোঽপি নবমোরসঃ। " কাব্যপ্রকাশ।

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত এই আটটি রস নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত শান্ত নামক একটী নবম রস আছে, যাহাতে নির্ব্বেদ [সংসার-বৈরাগ্য] স্থায়িভাব; অর্থাৎ নির্ব্বেদ না হইলে শান্তরস হইতে পারে না। এই প্রাচীন রীতি অবলম্বন করিয়া প্রথমে শৃঙ্গার তাহার পর হাস্যপ্রভৃতি রসের ক্রমে বর্ণনা করিবেন তর্কালঙ্কার মহাশয় রসতরঙ্গিণীর মুখবন্ধে অস্ফুটভাবে এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রসতরঙ্গিণী তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্যমাত্র সফল করিয়াছিল যে হেতু ইহা শৃঙ্গার রসাত্মক। কিন্তু কার্য্যের গুরুভারে প্রপীড়িত হইয়া তিনি হাস্য প্রভৃতি রস স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থে বর্ণনা করিতে অবসর পান নাই। কিন্তু যদিও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থে হাস্যাদি রস বর্ণন করেন নাই তথাপি নবরস বর্ণনাতেই তাঁহার যে শক্তি ছিল,

বাসবদত্তা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে। এই বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য বাসবদত্তা হইতে বিবিধ-রস-বিষয়িণী উদাহরণ-মালা উদ্ধৃত হইল।

শৃঙ্গাররসের উদাহরণ রসতঙ্গিণীতে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা ভিন্ন বাসবদত্তার ২০১ পৃষ্ঠায় "সম্ভোগশৃঙ্গার বর্ণন" সম্ভোগশৃঙ্গাররসের একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্থল।

উচ্ছিন্ন হিরণ্যনগর দর্শনে কন্দর্পকেতু ও তাঁহার সখার দুঃখ।

রাগিণী মল্লার। তাল জৎ।

মরি! মরি! দেখি একি নগর এমন,
নাহি চিহ্ন ধন জন নিবিড় গহন।
শ্রীরাজ বিক্রমালয়, কিরূপে হইল লয়,
হেন মোর মনে লয়, কি শমন সদন॥ ধ্রু

সে যে সহজে সহ যে প্রজা রাজা হীন পুরী।
যথা শ্রীহীন মলিন ক্ষীণ পতিহীন নারী॥

চলে চাইতে চাইতে চারি দিকু চল-চিত।
যথা পরিপাটী রাজবাটী, হয় উপনীত॥
করে মহারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই ঘরে।
তথা বানর, বানরী সনে, সুখে কেলী করে॥
যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রী সাত বসিতেন ধীরে।
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর॥
দোঁহে দেখে এই, দৈবদুঃখে দুঃখিত হৃদয়।
যবে যায় জলাশায় যথা আছে জলাশয়॥
দেখে সুচারু শোভিত সরসিজ সরোবর।
সদা শোভিছে সোপান সারি সব থরেথর॥
করে কমল কলিতে অলিকুল কল কল।
বহে ধীরে ধীরে সমীর সে নীর টল টল॥ ইত্যাদি।

ইহা করুণরসের উদাহরণ।

কামিনীর অদর্শনে কন্দর্পকেতুর বিলাপ।

হায়! কি করিনু, কেন বা আনিনু,
হইনু বধের ভাগী?
আহা! কতজন, করে আরাধন,
পাবে ব'লে তোমা ধন।
আমি তোমা-ধনে, এঘোর গহনে,
দিলাম কি বিসর্জ্জন?
ওহে শুন বিধি! সিঞ্চিয়া জলধি,
যদি নিধি দিয়ে ছিলে।
কি করম দোষ, পেয়ে ক'রে রোষ,
পুনরায় হ'রে নিলে?

হায় ! কবে কার, কিবা অপকার,
বল করিয়াছি আমি ?
কেন এত দুঃখ, দিলে চতুর্ম্মুখ !
হইলা বিমুখ তুমি ?
সেই সার বিনে, তবে কি কারণে,
অসার সংসারে রই ;
আর কি এখন, আছয়ে শরণ।
আমার মরণ বই ?
পিতা মাতা দারা, হ'যে বন্ধু হারা,
যে জন বাঁচিয়া রয়।
ধিক্ সে জীবনে, কহিছে মদনে,
তার বেঁচে বাঁচা নয়॥ ইত্যাদি।

ইহা করুণবিপ্রলম্ভরসের উদাহরণ।

যোগমায়ার স্তব।

বাণ-খরশান-সুরুপান-বর-পাণিনি !
ঘোর-রণ-রঙ্গ-ঘন-ঘুঙ্গুর-নিনাদিনি !
কৃত্ত-করবাল-নৃকপাল-কর-কারিণি !
দৈত্য-দলহীন-বল-জীবন-সংহারিণি !
লট্টপট-দীর্ঘজট-কট্টমট-ভাষিণি !
লিহি-লিহি-লোল-জিহি-হিহি-হিহি-হাসিনি !

খড়্গ-কৃত-খণ্ড-নরমুণ্ড-বর-মালিনি !
ধক্-ধক্-ফেরুমুখ-মধ্য-শিখি-জ্বালিনি !
দম্ফ করি ঝম্প, রণ-ঝম্প-মহী-কম্পিনি !
দম্ভ করি, দম্ভরব-ভূতগণ-দম্ফিনি !
অঙ্গ-কতি-ভঙ্গ-রণ-ভঙ্গী-বহু-রঙ্গিণি !
মুণ্ড লয়ে তাল লয়ে সঙ্গে নাচে সঙ্গিনি !
রত্নে কর যত্ন হে ! সপত্ন-ভয়-হারিণি !
দেহি ! মদনায় দৃঢ়-ভক্তিময়ি ! তারিণি ! ইত্যাদি ।

ইহা রৌদ্ররসের উদাহরণ ।

সিংহ ও হস্তীর যুদ্ধ ।

হস্তীবর মত্ত হস্ত, করিয়া ক্ষেপণ ।
আস্তে ব্যস্তে ত্রস্ত হয়ে, করিছে গমন ॥
হেন কালে এক সিংহ, সিংহনাদ করে ।
লাঙ্গুলে লংঘিয়া এলো, মাতঙ্গেরোপরে ॥
চিৎকারে চিৎকার হয়ে, পড়ে কত পশু ।
সেই শব্দে স্তব্ধ শুনে, মরে পশু শিশু ॥
সংঘাত হইয়া যেন, শত বজ্রাঘাত ।
একবারে হস্তিবরে, হইল আঘাত ॥
লাঙ্গুলের চট্‌চটি, দন্ত কট্‌মটি ।
নখরের খিটি খিটি, মুখের খামাটি ॥
রাগে আগে জাগে সব, শরীরের শির ।
তর্জ্জন গর্জ্জন ঘন, করিয়া গভীর ॥
উগ্ররূপী অগ্রে গ্রীবা, ব্যগ্রে করি গ্রাস ।
আক্রোশে কর্কশ দৃষ্টি, করিয়া প্রকাশ ॥

ঝপটে চপেটাঘাত, করিয়া দপটে।
করি শির কপাট, দোফাট কৈল চোটে॥
ভগ্ন-কুম্ভ-লগ্ন-মুক্তা-ফল, গেল ফুটে।
দর দর রুধির, অধীর হয়ে ছুটে॥
মাতঙ্গের ভঙ্গ অঙ্গ, করে ধড় ফড়।
তাহে লক্ষ বৃক্ষ ভাঙ্গে, যেন বহে ঝড়॥
এই রূপে কেশরী, আসুরী কর্ম্ম করে।
হস্তি-মস্ত-মস্তিষ্ক, লইয়া গেল হ'রে॥ ইত্যাদি।

ইহা বীররসের উদাহরণ।

বিন্ধ্যবাসিনী দর্শন।

কার বামা সমরে নীরদবরণী। হাহাকারা
পড়িছে রুধির-ধারা চঞ্চলা কুলবালা বিহ্বলা রমণী॥
শব শিব হৃদি পরে, অভয় বিতরে করে, নরশির বামে ধরে।
এলোকেশী, দিগম্বরী, করে অসি, ভয়ঙ্করী, নগনা, মগনা,
ত্রিলোচনী॥ ভাবিয়ে রতন বলে, হৃদি সরোরুহ-দলে,
হ্রাং হ্রিং স্থিরীভব ত্রৈলোক্যতারিণী॥ ইত্যাদি।

ইহা ভয়ানকরসের উদাহরণ।

কামিনী ও কন্দর্পকেতুর পলায়নকালে শ্মশান দর্শন।

সাহসে বান্ধিয়ে হিয়ে, দক্ষিণে মশান দিয়ে,
দ্রুতগতি চলিল হেলায়॥

হরিহরের বর্ণনা।

তার ভিতর কি মনোহর হরিহর মূর্ত্তি !
হেরে হয় যে, হৃদয়-শতদল-দল-স্ফূর্ত্তি !
মরি ! কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে !
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে !
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ !
আধা ফণিতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ !
আধা কপাল ফলকে শোভে অলকার পাঁতি !
আধা ধক্‌ধক্ জ্বলিছে জ্বলন দিবা রাতি !
আধা তিলক আলোকে তিনলোকে করে আলা !
আধা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা বাসে ভালা !
কিবা নলীনমলিনকারি নয়ন তরল !
আধা ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আঁখি যেন রক্তোৎপল !
আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল !
ইথে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল !
আধা বনমালা গলায় ভুলায় গোপীমন !
আধা রুক্ষ অক্ষমালা আলা করে ত্রিভুবন !
আধা কুঙ্কুম কস্তুরি হরিচন্দন চর্চ্চিত !
আধা কলেবর ভূষাকর ভষ্ম-বিভূষিত !
কিবা কর-কিসলয়-যুগে শোভে শঙ্খ চক্র !
আধা অমর ডমরু করে আর শিঙ্গা বক্র !
আধা কালিয়ার কটিতটে আঁটা পীতধড়া !
আধা বাঘছালা ভোলার ভুজগ মালা বেড়া !
আধা চরণ-কমলে শোভে কাঞ্চন-মঞ্জীর !
আধা ফণিমালা ফোঁশ ফোঁশ গরজে গভীর !

বেতাল পিচাশ ঘটা, কারো শিরে রুক্ষ জটা,
কেহ কটা-পিঙ্গল-লোচন।
ডাকিনী শাখিনী দানা, শ্মশানে পাতিয়া থানা,
শব সব করয়ে ভক্ষণ॥
যক্ষ রক্ষ ভুত প্রেত, কেহ কালো কেহ শ্বেত,
চিতা হ'তে লয়ে যায় শব।
পচা শুষ্ক কেবা বাচে, মৃতকায় পেয়ে নাচে,
আনন্দেতে হুহুঙ্কার রব॥
করতলে দিয়ে তাল, বেতাল নাচয়ে ভাল,
ভৈরবে মাভৈঃ রবে ফেরে।
সর্ব্বাঙ্গে বিকট শির, গলে ঝোলে নরশির,
চন্দ্রায়ণ হয় রূপ হেরে॥
ফেরে কত ফেরুপাল, পিশিত-রসিত-গাল,
তবু নৃকপাল নাহি ছাড়ে।
গলিত-পলিত-কায়, কবলে কবলে খায়,
শেষে চরবায় হাড়ে হাড়ে॥
কেহ বা তুলেছে মড়া, অতি পুতি পচা সড়া,
ঝকড়া করয়ে ল'য়ে তাই।
যাহার অধিক জোর, তাহারি অধিক সোর,
তোর মোর বাছা বাছি নাই॥
শৃগালের খেঁকাখেঁকি, পিশাচের মেকামেকি,
ঢেকাঢেকি হেঁকাহেঁকি রব।
দেখিয়া বিষম ভয়, ধীরে ধীরে ধনী কয়,
প্রাণনাথ! একি দেখি সব? ইত্যাদি।

ইহা বীভৎসরসের উদাহরণ।

দেখেএইরূপ অপরূপ রূপ হরিহর!
রাজা পূজা বিধি যথাবিধি করে ততঃপর! ইত্যাদি।

ইহা অদ্ভুতরসের উদাহরণ।

কামিনীর অদর্শনে কন্দর্পকেতুর বিলাপ।

ওগো শিবদারা! পরাৎপরা তারা!
তুমি ভবভয়-হরা!
এবার আমারে, ভব-পারাবারে,
পার কর তারা! ত্বরা।
ভবে আনাগনা, জঠর যাতনা,
সহেনা সহেনা আর।
এবার তনয়ে, চাহ গো! অভয়ে,
এ নহে কঠিন ভার॥
আর কেবা আছে, যাব কার কাছে,
কব কারে মনোদুঃখ?
জননীর ছেলে, জননীরে ফেলে,
আর কার চায় মুখ?
ভব-বন ঘোর, তাহে কাল চোর,
পাতিয়া রয়েছে থানা।
কি জানি কখনে, এ দেহ ভবনে,
আসিয়া দিবেক হানা॥
শুনগো জননি! 'পতিত-পাবনী'
আপনি ধরেছ নাম।
তবে যে পতিতে, এবার তারিতে,
কেনগো! হয়েছ বাম?

ওগো ভবদারা! মাতা পিতা যারা,
সময়ে সকলি বটে।
অসময়ে পেলে, যায় তারা ফেলে,
কেবল তোমার তটে॥
তুমিতো তেমনি, নহগো জননি!
অমনি লইয়া কোলে।
মুখে দাও পয়, দূর [illegible] ভয়,
সে জন যন্ত্রণা ভোলে॥
তুমি মূলাধার, জেনে সারাৎসার
শরণ লয়েছি তোমা।
দেহি স্থান দীন, কুরু পরিত্রাণ,
ঠেলনা চরণে আমা॥
জ্বলিছে বিগ্রহ, করিছে নিগ্রহ,
গ্রহ-গণ দিন দিন।
আমি গো! পড়েছি, শরণ লয়েছি,
ভকতি-শকতি-হীন॥
কামনা করিব, জনম পাইব,
লভিব কামিনী-ধন।
আজি তব তীরে, এ পাপ শরীরে,
করিব গো! বিসর্জ্জন॥
এতেক বলিয়া, সলিলে থাকিয়া,
ডাকে জয় সুরধুনি! ইত্যাদি।

ইহা শান্তরসের উদাহরণ।

আর জন বলে বট, উপযুক্ত বর।
আছে বটে ধন জন, বহু গুণাকর ॥
কিন্তু তব মুখ-বিধু, নিরখিয়া ভাই।
কেমনে বরিবে সে যে, আমি ভাবি তাই ॥
মুখ পোড়া বানর-সম, অতি মনোলোভা।
উল্লুক লুকায় লাজে, দেখে যার শোভা ॥
অতএব অনায়াসে, শ্রীমুখের বেশে।
দেখিতে না ভর সবে, বরিবেক এসে ॥
অতঃপর সেই ধনী, আমাকে বরিবে।
হৃদয়ের হারে সদা, গাঁথিয়া রাখিবে ॥
আর জন বলে সত্য, বটে তব সনে।
কামিনীর স্বয়ম্বরা, নাহি হবে কেনে ?
তব কান্তি কান্তি লৌহ, কান্তি ভ্রান্তি কর।
সুতরাং কেন নহ, উপযুক্ত বর ?
লোহার কার্ত্তিক যেন, সুঠাম গঠন।
কি কব সঙ্গেতে নাই, ময়ূর বাহন ॥
অতএব ধিক্ ধন, ধিক্ তোর গুণ।
ফিরে ঘরে যাও ভাই, মোর কথা শুন ॥

ইহা হাস্যরসের উদাহরণ।

উপসংহার ।

তর্কালঙ্কারের নবরস বর্ণনাতেই যে বিশেষ নৈপুণ্য ছিল ইহা উদাহরণ উল্লেখ পূর্ব্বক সপ্রমাণ করিয়া তর্কালঙ্কার প্রকৃত কবি কি না ও তিনি ভারতের অনুকরণ-দোষে কতদূর দূষিত তদ্বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কোন কোন ব্যক্তির এরূপ বিশ্বাস যে তর্কালঙ্কার অনুবাদকমাত্র, কবি নহেন। যেহেতু তৎপ্রণীত রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা নামক দুই খানি গ্রন্থই সংস্কৃতের অনুবাদমাত্র। দুই খানির এক খানিও স্বাধীন গ্রন্থ নহে। অনুবাদে প্রকৃত কবিত্বশক্তির কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। অন্যের ভাবসকল ভাষান্তরে প্রকাশ করাই অনুবাদকের কার্য্য। যাঁহার নিজের কোন ভাব নাই তিনি কিরূপে সুকবি হইতে পারেন্? এক্ষণে দেখা যাউক্ বাসবদত্তা ও রসতরঙ্গিণী এই দোষে দূষিত কি না। যাঁহারা সংস্কৃত বাসবদত্তা পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তা পূর্ব্বোক্ত দোষে বিন্দুমাত্রও দূষিত নয়। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে সংস্কৃত বাসবদত্তা গদ্যগ্রন্থ। তর্কালঙ্কার এতল্লিখিত উপাখ্যানমাত্র অবলম্বন করিয়া নিজের ভাষায়, নিজের ভাবে

এই বাসবদত্তা গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বাসবদত্তার পরস্পর ভাবসাদৃশ্য কিছুই নাই। অধিক কি যে সকল সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এক্ষণে সুবন্ধু ও তর্কালঙ্কারকৃত বাসবদত্তা গ্রন্থদ্বয়ের নামগত ঐক্য সন্দর্শন করিয়া তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তা সুবন্ধুর বাসবদত্তার অবিকল অনুবাদ বলিয়া খ্যাপনা করিতেছেন ও কবি-সংখ্যা হইতে তর্কালঙ্কারের নাম উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন, তর্কালঙ্কার তাঁহার গ্রন্থের "বাসবদত্তা" এই আখ্যা না দিলে বোধ হয় সেই মহাত্মারা উভয়-গ্রন্থগত আখ্যান-সাদৃশ্যমাত্র ও উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। ফলতঃ যাঁহারা তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তাকে সংস্কৃতের অবিকল অনুবাদ বলিয়া ঘোষণা করেন তাঁহারা আপন আপন সংস্কৃতানভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করেন সন্দেহ নাই। রসতরঙ্গিণী যে অনুবাদদোষে দূষিত ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। কিন্তু রসতরঙ্গিণী-রচয়িতা যে কবি নহেন এ কথা কোন মতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহা পাঠ করিলে মনে অপূর্ব্ব ও সান্দ্র আনন্দের উদয় হয় তাহাই যখন কাব্যের লক্ষণ বলিয়া অলঙ্কারকর্ত্তারা গণনা করিয়া গিয়াছেন, আর রসতরঙ্গিণীর বাঙ্গালা অনুবাদ-পাঠে সহৃদয়-মাত্রেরই হৃদয় যখন সেই অপূর্ব্ব ও সান্দ্র আনন্দের উপলব্ধি করিয়া থাকে, তখন রসতরঙ্গিণী প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয় না একথা বলা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য সন্দেহ নাই। রসতরঙ্গিণীর বাঙ্গালা শ্লোকগুলি অনেকস্থলে মূল সংস্কৃত

শ্লোকগুলি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মূল অপেক্ষা অনুবাদের উৎকর্ষ আর অতিঅল্প স্থলেই লক্ষিত হয়। আমার বাক্যের সার্থকতা সম্পাদনের নিমিত্ত রসতরঙ্গিণী হইতে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

১ম। উদাহরণ।

লোচনে হরিণ-গর্ব্ব-মোচনে!
মা বিভূষয় কৃশাঙ্গি! কর্জ্জলৈঃ।
শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ
সায়কো হি গরলৈর্ন লিপ্যতে॥

সুধু সুধামুখি! নয়নে তব,
যদি যুবজনা মোহিত সব;
তবে বল দেখি! কি ফল দেখে
উজ্জ্বল করিছ কজ্জ্বল মেখে?
সুধু সরে যদি জীবন হরে,
কি ফল গরল মাখায়ে তারে?

২য়। উদাহরণ।

জানীমো বয়মাসনস্য কমলে তস্যা মুখেন্দোস্ত্বিষা
সংকোচং সমুপাগতে স ভগবান্ দুস্থঃ সরোজাসনঃ।
ভুগ্নং ভ্রূলতিকাযুগং বিহিতবান্ বক্রে দৃশৌ সৃষ্টবান্
মধ্যং বিস্মৃতবান্ কচাংশ্চকুটিলান্ বামভ্রুবঃ সৃষ্টবান্॥

অনুমানি অনুরাগে, বিধি তার আগে ভাগে
বদন কমলখানি যতনেতে সৃজিল।

স্বজিতে স্বজিতে তায়, বসিতে ঘটিল দায়,
মুখ দেখে আসনকমল মুখ মুদিল ॥
ব্যস্ত হ'য়ে প্রজাপতি, গড়িলেন দ্রুতগতি,
তাই অতি ভুরুপাঁতি, বাঁকা হ'য়ে রহিল
বেঁকিল নয়ন শেষ, কুটিল হইল কেশ
গঠিতে ম.ধ্যারদেশ একেবারে ভুলিল ॥

৩ য়। উদাহরণ।

উদেতি ঘনমণ্ডলী নটতি নীলকণ্ঠাবলি-
স্তড়িদ্বলতি সর্ব্বতো বহতি কেতকীমারুতঃ।
তথাপি যদি নাগতঃ সখি! স তত্র মন্যেঽধুনা
দধাতি মকরধ্বজস্ত্রুটিতশিঞ্জিনীকং ধনুঃ ॥

সজল জলদগণ, ব্যাকুল করায় মন,
তাহে আরো তার কোলে তড়িতের রেখা লো!
কেতকী-বনের বায়, মন্দ মন্দ বহে তায়,
আনন্দে ময়ূরগণ ঘন ডাকে কেকা লো!
কি হইবে বল সোই! তথাপি সে এলো কোই?
হেন দিনে কেমনে রহিব আমি একা লো!
বুঝি মদনের পাছে, ধনুর্গুণ ছিঁড়িয়াছে,
অনুমানি সে জনের তাই নাই দেখা লো!

৪ র্থ। উদাহরণ

সমন্তাদুত্তপ্ত স্তব বিরহদাবাগ্নিশিখয়া
কৃতোদ্বেগঃ পঞ্চাশুগমৃগযুবেধব্যতিকরৈঃ।

তনূভূতং তাবত্তনুবনমিদং হাস্যতি হরে !
হঠাদদ্য শ্বো বা মম সরচরী প্রাণহরিণঃ ।

তোমার বিরহ দাহে, সদা দেহবন দহে,
ব্যাকুল হইয়া ভয়ে ক্ষণ স্থির হয় না।
মদনমৃগয়ু তায়, ধনুর্ব্বাণ লয়ে ধায়,
সদাই বধিতে চায় প্রাণে আর সয়না॥
তনুবন জ্বলে গেলো দিন দিন ক্ষীণ হ'লো,
মদনের ভয়ে আর থাকিতে হে চায় না।
আজি কালি মধ্যে সবে, দেহবন ছেড়ে যাবে,
প্রাণহরিণী তার বুঝি আর রয় না॥

৫ ম। উদাহরণ।

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ
অস্মাকন্তু গতে নাথে গতা নিদ্রা চ বৈরিণী।

অন্যত নারীর পতি পরবাসে যায় লো!
ভাগ্যগুণে স্বপনে কে না দেখে তায় লো!
কেমন কপাল মোর ভাবি আমি তাই লো!
যে অবধি পতি গেছে নিদ্রা আর নাই লো!

৬ ষ্ঠ। উদাহরণ।

যদি গন্তাসি গমিষ্যসি মা বদ যামি যামীতি।
আপাতকুলিশপাতাদ্ব্যথয়তি ঘোষস্তু মর্ম্মাণি॥

একান্ত যদি হে কান্ত! যাবে দেশান্তর।
যাই যাই আর বলোনা হে! নিরন্তর॥

আপাতত বজ্রপাত মস্তকেতে সয় !
পতনের শব্দে কিন্তু মর্ম্মান্তিক হয় ॥

৭ ম উদাহরণ ।

নৈতৎ প্রিয়ে ! চেতসি শঙ্কনীয়ং
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি ।
বিয়োগতপ্তং হৃদয়ং মদীয়ং
তত্র স্থিতা ত্বং পরিতাপিতাসি ॥

ওলো ধনি ! কেন হেন পাইয়াছ ভয় ।
হিম-করে দাহ করে একি কভু হয় !
তব বিরহেতে তপ্ত মম বক্ষস্থল ।
তাহাতে থাকিয়া তুমি তাপিতা কেবল ॥

রসতরঙ্গিণীতে বাঙ্গালা যে শ্লোকটীই পাঠ করি, সেই শ্লোকটীই মূল সংস্কৃত শ্লোক অপেক্ষা অধিকতর রমণীয় বলিয়া বোধ হয়।

গ্রন্থবাহুল্য-ভয়ে আর ও উদাহরণ উদ্ধৃত হইল না। যাহা উদ্ধৃত হইয়াছে সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাঠক-মাত্রেই ইহা দ্বারা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন যে অনুবাদক-কবি মূল কবিগণ অপেক্ষা অধিকতর কবিত্ব-শক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমি অনেক সহৃদয় পাঠককে এরূপ বলিতে শুনিয়াছি যে বাঙ্গালাভাষায়, রসতরঙ্গিণীর ন্যায় অনুবাদ আর হয় নাই। প্রত্যুত ভাষান্তরে অনুবাদ করিতে গেলে মূলের সৌন্দর্য্য রাখাই দুরূহ ব্যাপার। যে কবি অনুবাদে মূল কবিগণ অপেক্ষা অধিকতর সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তিনি যে

উচ্চ শ্রেণীস্থ কবি ছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অসহৃদয় ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাই বলুন না কেন, তর্কালঙ্কার যদি শুদ্ধ রসতরঙ্গিণী লিখিয়াই পরলোক গমন করিতেন তাহা হইলেও কাব্যরসাস্বাদনপটু সংস্কৃতাভিজ্ঞ সহৃদয় মাত্রেই তাঁহাকে সুকবি বলিয়া স্বীকার করিতেন।

বাসবদত্তা যে অনুবাদ দোষে দূষিত নয় তাহা পূর্ব্বেই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে বাসবদত্তা, ভারতের অন্নদামঙ্গলের অনুকরণ-দোষে দূষিত কি না তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতের অন্নদামঙ্গল ও তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তার পরস্পর তুলনা করিতে গেলে, দেখিতে হইবে, এক কিম্বা অনুরূপ বিষয়ে তাঁহারা দুই জনে কিরূপ কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। একের ভাব সকল অপরে অপহরণ করিয়াছেন কি না ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অন্নদামঙ্গল ও বাসবদত্তা হইতে এক বা অনুরূপ বিষয়ের উদাহরণ-মালা উদ্ধৃত করিতে হইবে।

অন্নদামঙ্গল ও বাসবদত্তা উভয়েরই প্রথমে বন্দনা প্রকরণ। তর্কালঙ্কারের বন্দনাগুলি যে ভারতের বন্দনাগুলি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তাহা একটী উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। তর্কালঙ্কারের বিষ্ণুবন্দনা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে এক্ষণে অন্নদামঙ্গলের বিষ্ণুবন্দনা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

কেশবায় নমো নমঃ, পুরাণ পুরুষোত্তম,

চতুর্ভুজ গরুড়বাহন।

বরণ জলদ ঘটা, হৃদয়ে কৌস্তুভ ছটা,

বনমালা নানা আভরণ॥

কৃপা কর কমললোচন।

জগন্নাথ মুরহর, পদ্মনাভ গদাধর,

মুকুন্দ মাধব নারায়ণ॥

রামকৃষ্ণ জনার্দ্দন, লক্ষ্মীকান্ত সনাতন,

হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠবামন।

শ্রীনিবাস দামোদর, জগদীশ যজ্ঞেশ্বর,

বাসুদেব শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥

শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, সুশোভিত চারি ভুজ,

মনোহর মুকুট মাথায়।

কিবা মনোহর পদ, নিরুপম কোকনদ,

রতন নূপুর বাজে তায়॥

পরিধান পীতাম্বর, অধর বান্ধুলি বর,

মুখ সুধাকরে সুধাহাস।

সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, নাভিপদ্মে প্রজাপতি,

রূপে ত্রিভুবন পরকাশ॥

ইন্দ্র আদি দেব সব, চারি দিগে করে স্তব,

সনকাদি যত ঋষিগণ।

নারদ বীনার তানে; মোহিত যে গুণ গানে,

পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন॥ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় তুলনাস্থল বিদ্যাও কামিনীর রূপবর্ণন প্রকরণ। উভয় কবিই প্রথমে বেণীর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া শরীরের উপমেয়স্থল সকল যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন,

তাহা পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে তর্কালঙ্কার ভারতের অনুকরণ দোষে বিন্দুমাত্রই দূষিত নন্। আমি উভয় গ্রন্থ হইতে এক একটী উদাহরণ তুলিয়া ইহা সপ্রমাণ করিতেছি।

১ ম উদাহরণ।

বিদ্যার রূপবর্ণন। (বেণী)

বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥

কামিনীর রূপবর্ণন। (বেণী)

কুটীল কুন্তলে কিবা বান্ধিয়াছে বেণী!
কুণ্ডলী করিয়া যেন, কাল-কুণ্ডলিনী,
রমণী স্বরূপ মণি, সদা রক্ষা করে।
তার চোরে অপাঙ্গ ভঙ্গীতে বিষে জারে॥

এই স্থলে বেণী সাপিনী-স্বরূপ এই রূপকমাত্র উভয় গ্রন্থ-সাধারণ। সংস্কৃত কাব্যে এরূপ রূপকের অপ্রতুল নাই। উভয়েই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন সুতরাং উভয়েই সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়াছেন ইহাই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সংস্কৃতে এরূপ রূপকের প্রচুরতা ও তর্কালঙ্কারের সংস্কৃত শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি সত্ত্বেও তিনি ভারতের অনুকরণ কেন করিবেন বুঝিতে পারি না।

বিদ্যার রূপ (ভ্রূ)

কিছার মিছার কাম ধনু রাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে।

কামিনীর রূপ (ভ্রূ)

ফুলধনু ছাড়ি ধনু, দেখিয়া ভ্রূধনু।
অভিমানে হর-হুতাশনে ত্যজে তনু॥
ভালে ভাল বিলসিত, অলকা বিলাসে।
মুখপদ্ম-মধু-আশে, অলি আসে পাশে॥

মুখ, পদ্মরূপে ও অলকাগুলি ভ্রমররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এ রূপকটি এস্থলে ভারতে নাই।

কামিনীর রূপ (নাশা)

নাশা বংশ নয়ন যুগল মাঝে শোভে।
যেন বৈসে শুকপক্ষী, ওষ্ঠবিম্ব লোভে!
কিম্বা নেত্র-সুধাসিন্ধু বিভাগের হেতু।
তার মধ্যে বুঝি বিধি, বান্ধিয়াছে সেতু!

এরূপ রূপক ভারতচন্দ্রে ত নাই, সংস্কৃত কাব্যে আছে কি না জানি না।

বিদ্যার রূপ (নয়ন)

কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ ল'য়ে কোলে॥

কামিনীর রূপ (নয়ন)

সুদীর্ঘ নয়ন! তাতে রঞ্জিত খঞ্জন।
সে চাঞ্চল্য শিখিবারে চঞ্চল খঞ্জন॥

এখানে কোন শব্দসাদৃশ্য বা রূপকসাদৃশ্য দেখিতে পাই না।

বিদ্যার রূপ (কটাক্ষ)

কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥

কামিনীর রূপ (কটাক্ষ)

একেত অসহ্য শর, কটাক্ষ বিষম।
তাহাতে অঞ্জন কটু কালকূট সম॥

(কটাক্ষের সম)—(কটাক্ষ বিষম)
(কালকূট কম)—(কালকূট সম)

অনেকে এই আপাতপরিদৃশ্যমান শব্দসাদৃশ্য দেখিয়া এরূপ অনুমান করিতে পারেন যে তর্কালঙ্কার ভারতের অনুকরণ করিয়াছেন কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবেন যে বস্তুতঃ এখানে বিশেষ শব্দসাদৃশ্যওনাই। কটাক্ষ বর্ণনস্থলে উভয়েই কটাক্ষ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া আর কি করিবেন? ভারত কটাক্ষকে ও তর্কালঙ্কার অঞ্জনকে কালকূটরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এখানে রূপকসাদৃশ্যও নাই। কালকূট শব্দের উভয়-সাধারণতা কবিদের চিন্তাসাদৃশ্য হেতু অথবা সংস্কৃতের অনুকরণ জন্য ঘটিতে পারে।

(সম)আর (বিষম) ; (কম) আর (সম) এই শব্দ-যুগলদ্বয় পরস্পর বিভিন্ন-প্রকৃতি ও বিভিন্নার্থবোধক।

বিদ্যার রূপ (দন্ত)

কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাঁতি, দন্তপাঁতি তার॥

কামিনীর রূপ (দন্ত)

কুন্দ-সুকুসুম-সম, দশনের শোভা।
ঈর্যায় দাড়িম্ব-বীজ, বুঝি শোণ আভা!

এখানে শব্দ বা রূপক সাদৃশ্য কিছুই নাই। এস্থলে তর্কালঙ্কারের রূপক, ভারতের রূপক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

বিদ্যার রূপ (ভুজ)

পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়ি ছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥

কামিনীর রূপ (ভুজ)

শোভে ভুজ-মৃণাল, লাবণ্য সরোবরে।
পাণিপদ্ম প্রকাশে, নখর-রবি-করে॥

এখানেও কোন রূপক বা শব্দ সাদৃশ্য নাই।

বিদ্যার রূপ (নাভি)

নাভি-কূপে যেতে কাম —শম্ভু বলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে॥

কামিনীর রূপ (নাভি)

ত্রিবলীর ঊর্দ্ধে তার, শোভে রোমাবলী।
নাভি-পদ্ম-গন্ধে যেন, ধায় ভৃঙ্গাবলী!

এস্থলে সহৃদয়-মাত্র স্বীকার করিবেন যে তর্কালঙ্কারের রূপক উৎকৃষ্টতর হইয়াছে।

বিদ্যার রূপ (মধ্যদেশ)

কত সরু ডমরু, কেশরী মধ্যখান।
হর গৌরী কর পদে আছয়ে প্রমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক, যে আঁখি ধরে, বিদ্যার মাজায়॥

কামিনীর রূপ (মধ্যদেশ)

সুবলনি মধ্যখানি, কি বাখানি তার !
আছে কি না আছে অনুমান করা ভার ॥

বিদ্যার অলঙ্কার (কঙ্কণ)

ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ-ঝঙ্কারে ।
পড়ায় পঞ্চম স্বরে, ভাবে কোকিলারে ॥

কামিনীর অলঙ্কার (নূপুর)

বুঝি মণি-নূপুরের, করি কলধ্বনি ।
পঞ্চস্বরে পঞ্চ-শরে, জাগায় সে ধনী ॥ ইত্যাদি ।

যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত হইল তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, তর্কালঙ্কার ভারতের অনুকরণ দোষে বিন্দুমাত্র দূষিত নন। উভয়েই যত রূপক ব্যবহার করিয়াছেন সে সমুদায়ই প্রায় অনুসন্ধান করিলে সংস্কৃতকাব্যসকলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কবিকঙ্কণ ও গৌরীর রূপবর্ণনস্থলে কবি-সমাখ্যাত সেই সকল রূপকেরই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। পাঠকগণের নিকট আমার বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ইহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

গৌরীর রূপ বর্ণন।

ঊরুযুগ করিবর, নাভি যেন সরোবর,
দুই ভুজ মৃণাল-সঙ্কাশ ।
নবীন অঙ্গের আভা, নানা অলঙ্কার শোভা,
অন্ধকার করয়ে বিনাশ ॥

অধর বন্ধুক-বন্ধু, বদন শারদ ইন্দু,
খঞ্জন-গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, ললাটে সিন্দুর ফোটা,
তনু-রুচি ভুবন-মোহন ॥
নাসায় দোলয়ে মতি, হীরায় জড়িত তথি,
যেন কমল ভাল সাজে।
তুলনা না দিতে পারি, তাহা অতি মনোহারি.
যেন সুধাকর তারা মাঝে ॥
গৌরীর বদন শোভা, লিখিতে নারিনু কিবা,
দিনে চন্দ্র নাহি দেয় দেখা।
ম্লান চন্দ্র এই শোকে, না বিচারি সর্ব্ব লোকে,
মিছে বলে কলঙ্কের রেখা ॥
গৌরীর দশন-রুচি, দেখিয়া দাড়িম্ব-বিচি,
মলিন হইল লজ্জাভরে।
হেন বুঝি অনুমানে, এই শোক করি মনে,
পক্ক কালে দাড়িম্ব বিদরে ॥
শ্রবণ উপর দেশে, হেম-সুকলিকা ভাসে,
কুটিল কুঞ্চিত কেশ-পাশ।
আষাঢ়ের মেঘ-মাঝে, যেমন বিদ্যুৎ সাজে,
পরিহরি চপলতা-ভাস ॥
স্থূলতা উদরে ছিল, বলে তা লুটিয়া নিল,
উরঃস্থল, জঘন দুজন।

কবিকঙ্কণের গৌরীর রূপ-বর্ণন পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে কবিকঙ্কণ ভারত ও তর্কালঙ্কার তিন জনেই সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত উপমান-সকলেরই ব্যবহার

করিয়া গিয়াছেন। ভারত, কবিকঙ্কণের এবং [illegible] ভারতের অনুকরণ করিয়া যান নাই। বস্তুতঃ প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ নব্য কবিদিগকে নূতন উপমানোদ্ভাবনের পথ পর্য্যন্ত রাখিয়া যান নাই। তাঁহারা প্রকৃতি-কানন হইতে অবচেয় যাবতীয় উপমানের চয়ন করিয়া গিয়াছেন। নূতন চয়নের দ্রব্য আর কিছুই রাখেন নাই। নব্য কবিদিগকে পূর্ব্বাবচিত উপমান-কুসুম-নিচয় হইতেই অভিমত কুসুম মনোনীত করিতে হয়। এই জন্যই এত উপমানসাদৃশ্য, এই জন্যই এত ভাবসাদৃশ্য, এবং এই জন্যই এত শব্দসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

সম্পূর্ণ।